যোগাযোগ

সুভাষ ঘোষ

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ল-বুক কর্ণার।

ব্যবসা-ট্যবসা ভাল লাগে না মহাদেও খেতনের। ভীড়ের বহর দেখে তাই দোকান খোলার সময়টা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত আটটা।

দোকান নয়। বৈঠকী সজ্জার আসর। মেহগনী কাঠের ছোট্ট একটা সুদৃশ্য টেবিল। ওপরে বেলজিয়ম গ্লাসের কভার। নীচে ডেট্‌কার্ড। টেবিলটিকে ঘিরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-পাদের আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ খান পাঁচ-ছয় মূল্যবান চেয়ার। বন্য পশু আর ভয়াল সাগর জীবের মুখগুলো চেয়ারের হাতল স্পর্শ করলেই করায়ত্ত হয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে শিথিল ও অবচেতন মনে মহাদেও খেতন দৃঢ়-মুষ্টিতে সেগুলো নিষ্পেষিত করতে থাকেন।

পেছন সারিতে ড্রাগন-উল্কি-পরা গোটা কয়েক আলমারী। মাঝের আলমারীটির মাথায় কষ্টিপাথরে খোদাই করা ত্রিমূর্তি শাখামৃগ। রস-রসিকতা আর হিতোক্তির প্রতিমূর্তি।

কু-কথা বলবো না,
কু-কথা শুনবো না,
কু-দৃশ্য দেখবো না॥

এস। দোকানে বস। দামী-দামী বইগুলো উল্‌টে-পাল্‌টে দেখ। ছাপা-বাঁধাই-এর প্রশংসা কর। আর আপ্যায়ন নাও।

কিন্তু বই কিনতে চেও না। তাহলেই মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে মহাদেও খেতনের। কি করবে কিনে? এটা বেস্টের এভিডেনস্ একটু। ন-শ' টাকা সেট।

তাও কিনবে! ও, তুমি রায়বাহাদুর চঞ্চল সিং এর মুহুরী? নমস্ত তিনি। কিন্তু তবু কি করবে বেষ্টের এভিডেনস্ একটু কিনে? বড় চালু বই এ'টি। কিনে নিয়ে যেতে-যেতে বাজারে নতুন সংস্করণ বেরিয়ে আসবে। তখন ন' ন-শ' টাকা জলে যাবে তোমার।

তার চে' এক কাজ কর। যখন খুশি, যেদিন খুশি দোকানে এস। বইএর গায়ে হাত বুলিও। প্রয়োজন হয় দু-একটা রেফারেনস্ টুকে নিও। নিষেধ করব না। আর কিনতেই যদি হয় তাহলে কিনে নাও সরকারী-প্রকাশনের বেয়র একটু। দাম মাত্র বারো আনা। গরমেণ্টের বই। ভুল-চুক থাকবার জো নেই। রামা-শ্যামার ছাপাখানা নয়; রাষ্ট্রপতির আইন দপ্তরের খাস প্রেসে ছাপা। ডিগ্রীধারী কম্পোজিটর। পুরান হলেও ভয় নেই। সের দরে বেচে দিও। অন্ততঃ অর্ধেক মূল্য পাবে। হাতে নিয়ে দেখ—কি ভারী বই! বারো আনায় মহাভারত !!

ওঃ! তবু বেষ্টের এভিডেনস্? না, না, আর বক্-বক্ করিও না বাপু, মাথা গরম হয়ে যায়। যাও। নিয়ে যাও এই নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার।

খদ্দের বিদায় করে গুম্ হয়ে বসে থাকেন মহাদেও খেতন। বেষ্টের নাম করে মাথা গরম করে দিয়ে গেছে। সময় লাগে। আস্তে-আস্তে আবার সুস্থির হয়ে বসেন।

আবার খদ্দের! জ্বালালে।

কি চাই? মুল্লার সি. পি. সি—আছে বই কি! এই যে? মূল্য বিয়াল্লিশ। দিন-দিন বইয়ের দাম যা বাড়ছে বাপ-মা আর ছেলেপুলেদের পড়াতে পারবে না। কিনবে! কে তুমি বাছা? সিদ্ধি? তা আজকাল পোশাকে-আসাকে সিদ্ধি আর সিংহলীতে তফাৎ বোঝা দায়।

অতঃপর সিদ্ধি ভাবায় মহাদেও খেতন বুঝিয়ে দেন, দেখ বাপু! মুল্লার সি. পি. সি. নিয়ে সুপ্রিম-কোর্টের সাগর পাড়ি দিতে পার। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খালে-বিলে অত ভারী জাহাজ চলবে না, কিনারায় আটকে থাকবে। ওখানে ভেলা চাই। যা' বলি তাই কর—কিনে নাও, এন একস্‌পিরিয়েনসড্ প্রফেসরের সি. পি. সি, মেড্ ইজি। দুবার নজর বুলিয়ে নিতে পারলেই আশি পারসেনট্ ইজি মার্কস্।

বইটি হাতছাড়া হবার ভয়ে কথা বলতে বলতেই মহাদেও খেতন সেটিকে

আলমারীতে তুলে দেন। তারপর চাবি লাগিয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখেন। সিভিল প্রসিডিয়র কোড্। ডি. এফ্ মুল্লা। কি সুন্দর বাঁধাই। কেমন ঝকঝকে ছাপা। ওঃ দেখতে-দেখতে মাথা গরম হয়ে ওঠে।

অন্যমনস্কের মত মহাদেও খেতন হাসেন। তাঁর পিঙ্গল-বর্ণ চোখ দুটো মুখের গোলাপ-গৌর মাংসপেশীর মধ্যে হারিয়ে যায়। মসৃণ গাল দুটো আরো লাল হয়ে ওঠে। উত্তর পঞ্চাশেও একটা রেখার বাধা নেই কোনখানে।

মনে হয় গতকালের ঘটনা। তখন দুপুর। আহারাদির পর বিলিয়ার্ড-রুমে গেছেন মহাদেও খেতন। কিউ আর বলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ঘড়ি দেখছেন মাঝে-মাঝে। এখন দুটো। ঠিক দুটো দশে আসবে চম্পাবাঈ।

কিন্তু তার পরিবর্তে ঘরে ঢুকলেন দাদীজী। পৌত্রের হাতে একমুঠো গিনি দিয়ে বললেন :

—যা-যা, দেখে আয়—মে' হয়েছে।

মাত্র আঠার বছর বয়সে নিজের সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হলেও লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন মহাদেও খেতন। মনে পড়ল এগারোটার পর থেকে দেখেন নি চম্পাবাঈকে। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আর একটা নতুন যুগ এসে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল পেছনকার যুগে! দাদীজীও চতুর্থ পুরুষে চলে গেলেন।

এত নিঃশব্দে হয়ে গেল সব! অবশ্য প্রাসাদোপম বড়া-হাবেলীতে সব অনুষ্ঠানের আভাষ সব সময় পাওয়া যায় না। তা'ছাড়া নারী মহলের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতার রেওয়াজ নেই এ' বাড়ীতে।

কিন্তু সময় এখনো হয়নি। গত রাতেও চম্পাবাঈ বুকের কাছ ঘেঁসে শুয়েছে। সময়ের প্রায় মাস খানেক আগেই এসে গেছে কল্পনা। মহাদেও খেতন তখুনি স্থির করলেন, মেয়ের নাম রাখবেন কল্পনা।

মৃদু চপেটাঘাত করে দাদীজী আবার বললেন :

—যা-যা দেখে আয়। তিনটে বেজে গেলে আর যেতে পারবি না; লগ্ন কেটে যাবে। যা—

মহাদেও খেতন গিয়ে সূতিকাগারে ঢুকলেন। নার্স পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের এক কোণে দাই সেঁক-তাপের আয়োজন করছিল। সে-ও সন্ত্রস্তে বেরিয়ে গেল।

চম্পাবাঈর কাছে এগিয়ে গেলেন মহাদেও খেতন। লজ্জা আর শ্রান্তিতে অর্ধনিমীলিত চোখে তাকিয়ে আছে চম্পাবাঈ। ষোলটি বসন্ত পাওয়া ষোল-কলার পূর্ণ শশির মত চম্পাবাঈ। প্রসবের পর একটুও টস্‌কায়নি। বৃষ্টি-ধোয়া ফুলের মত ঝর-ঝরে মনে হচ্ছে যেন!

কথা বলতে পারলেন না মহাদেও খেতন। সগুজাত মেয়েটার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। নীরবেই বেরিয়ে আসছিলেন ঘর থেকে।

খুব মৃদুস্বরে আমন্ত্রণ জানালে চম্পাবাঈ:

—দেখবে না!

মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েটির কাছে ফিরে এসে মুঠোভর্তি গিণিগুলো তার পাশে রেখে দিয়ে মহাদেও খেতন বাইরে চলে এলেন।

চম্পাবাঈ ভেবেছিল, ছেলে হয়নি বলে স্রষ্টা-পুরুষ খুশি হয়নি।

কিন্তু তা নয়। সুখ-দুঃখ কিছুই হয়নি তাঁর। নিজের সৃষ্টির বিস্ময় মহাদেও খেতনের সব অনুভূতিকে চাপা দিয়ে রেখেছিল।

মহাদেও খেতনের বয়স তখন আঠাশ। সেই সময় মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে মেওয়ার রাণা বংশের কন্যা চম্পাবাঈ মারা গেল।

উপভোগের পর নিবৃত্তির শুভ্র সংকল্পের মত শয্যা-শায়িতা চম্পাবাঈর শবটা যেন ভাসছে চোখের সামনে। মৃত্যুকে সেদিন বাঙ্ময় মনে হয়েছিল। দুঃখ হয়নি একটুও। দু'-ফোঁটা চোখের জলও পড়েনি। নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলেন শুধু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

চম্পাবাঈ মরেও ফাঁকি দিতে পারেনি। তার আত্মাকে মহাদেও খেতন বহু-পূর্বেই বন্দী করে ফেলেছেন। মেয়ে দু'টি—কল্পনা আর মায়াকে নিয়ে যেতে পারেনি সে। রক্ত-স্ফটিকে গড়া দুটো ছোট-ছোট ঐশ্বর্য তখন মহাদেও খেতনের করায়ত্ত।

দু-চোখ ভরা জল নিয়ে দাদীজী এসে ডাক্‌লেন:

—মুন্না !

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর পৌত্রকে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণায় সান্ত্বনা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সুযোগ পেলেন না। আবার ডাকলেন : মুন্না।

সে ডাকে মৃতের খাট ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, মহাদেও খেতন বেরিয়ে গেলেন।

বাবুজী সূর্যাপ্রসাদের কথা প্রায়ই মনে পড়ে। শীতকালেই বেশী করে মনে পড়ে, যখন ছোটা-হাবেলীর দু'তলায় দাঁড়িয়ে কোটরীওলাদের বাগানে নজর পড়ে, তখন।

বাবুজী থাকতেন গোলাপ বাগে। বড়া-হাবেলী থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। সে বাগানবাড়ী তাঁরই জীবনকালে কলকাতার জালানরা নিলামে কিনে নিয়েছে। সম্পত্তিটাকে রক্ষা করবার অনেক চেষ্টা করেছেন মহাদেও খেতন। অন্যান্য সম্পত্তি জলের দরে বিক্রী করেছেন তার জন্য। মুল্লার সি. পি. সি. তে আর কোন পন্থা ছিল না।

সূর্যাপ্রসাদ অস্তমিত সূর্যের মত ম্লান হাসি হেসে অভয় দিয়েছেন :

—আমি বেঁচে থাকতে গোলাপবাগ যাবে না, মহাদেও।

মহাদেও খেতন সর্ববিষয়ে বাবুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন। নিলাম হয়ে গেছে, এখনো কিসের জোরে তিনি বলছেন কথাটা !

তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে সূর্যাপ্রসাদ বলেছেন :

—সারাজীবন ভুলটুকুই আঁকড়ে থেকেচি—যাবার সময় ও-টুকু আর তোমার জন্যে রেখে যাব না।

যেদিন ঢোল বাজিয়ে জালানরা দখল নেবে, সেইদিনই মারা গেছেন সূর্যাপ্রসাদ। নিজের জীবনকালে সত্ত্ব ছাড়েন নি, মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে ধূলি-মুঠির মত হাত ঝেড়ে চলে গেলেন।

বাবুজীকে মনে পড়ে। কিন্তু কষ্ট করেও মাকে মহাদেও খেতন স্মরণ করতে পারেন না। শুনেছেন তাঁর জন্মের দু'-এক বছর পর থেকেই মা সন্ন্যাসিনী। গোলাপবাগের কামাতুর আত্মাকে স্বাধীনতা দিতে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। শোনা গেছে কোন পর্বত-কন্দরে বসে তিনি

গোলাপবাগের স্বেচ্ছাচারী আত্মার মুক্তি-তর্পণ করছেন। বোধহয় আজও করছেন।

তবু সশ্রদ্ধ-বিস্ময়ে মহাদেও খেতন বাবুজীর কথা আজও স্মরণ করেন। মনে করতে হয় না। আয়ত্বের বহু দূরে থেকেও তিনি সূর্যরশ্মির মত মহাদেও খেতনের স্মৃতির ওপর ছড়িয়ে আছেন। জীবনকালে তিনি একদিনের জন্যও পুত্রকে কাছে টানেননি। তাই মরেও হারিয়ে যাননি।

ছেলেবেলায় মাসের শেষ তারিখটার ওপর অদ্ভুত একটা মোহ ছিল মহাদেও খেতনের। খুব ভোরবেলায় তৈরী হয়ে নিজের ঘরের দু'-তলার জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। শিশু গাছটা দৃষ্টিতে বাধা দিত। তবু তারই ফাঁক দিয়ে তিনি সিংহের মাথা-ওলা বড়-বড় দুটো থামের মাঝে বড়া-হাবেলীর বিস্তৃত ফটকটার ওপর চোখ রাখতেন।

হঠাৎ ফটকের আড়াল থেকে শব্দ ভেসে আসত :

—হো-সি-য়া-র!

ছুটে এসে লছমণ পাঁড়ে ফটকটি উন্মুক্ত করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াত। সেলাম দিয়ে ঝুঁকে থাকত কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

কালো ঘোড়ার জুড়ি-গাড়ীতে সূর্যাপ্রসাদ আসতেন। গরাদ-হীন জানালা দিয়ে তখন আবক্ষ ঝুঁকে পড়তেন মহাদেও খেতন। দেখতেন বাবুজীকে। স্বর্গধাম সদৃশ গোলাপবাগের ইন্দ্রকে। গাড়ীখানা গাড়ী-বারান্দার ভাঁজের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর মহাদেও খেতন নীচে নামতেন।

অঙ্কের মাষ্টার বিদায় নিয়ে তখন ইংরেজির মাষ্টার ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করছেন।

দাদীজীর হুকুম :

—যখন ইচ্ছে মুন্না পড়বে। আর পড়ুক না পড়ুক আপনারা তাকে ডাকবেন না কখনো। শাসন করবেন না, বা ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না। মুণিমজীকে রোজ নিজেদের হাজরি লিখিয়ে দেন ত'—ব্যস্, এতেই পুরো মাইনে পাবেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সূর্যাপ্রসাদ সেই ঘরে ঢুকতেন। ছেলের মাথার ওপর হাত রাখতেন একবার। মহাদেও খেতনের সারা শরীরটা তখন বক্না-বাচুরের মত শির্-শির্ করে উঠত।

সূর্যাপ্রসাদ মাষ্টারকে বলতেন :

—কি পড়াচ্ছেন, ইংলিশ ? ভাষার ওপর নজর রাখবেন। ভাষাই ভাবের বাহন। আর ভাব ভালবাসার বাহক।

পুত্রকে বলতেন :

—শুধু মাতৃভাষা আর একটা বিদেশী ভাষাতেই আটকে থেক না। ও'সব সিলি মোহ ভাল নয়।

ঠিক একই কথা বলতেন বাংলা, হিন্দী আর উর্দু'র শিক্ষকদের।

কখনও বা মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত সূর্যাপ্রসাদের। হঠাৎ তাঁকে বলতেন :

—একটা নতুন শের শোনান ত' মৌলবী সাহেব ?

প্রৌঢ় মৌলবী সাহেব কিছুক্ষণ সূর্যাপ্রসাদের চেহারার বাদশাহী সৌষ্ঠবের দিকে বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাঁরই উপযুক্ত একটা শের সুর করে দু'-কলি আবৃত্তি করতেন :

হস্র মে ভী খুস্র্ বনা শান্ সে জায়েংগে হম্।
আউর অগর পুরসিশ্ ন' হোগি ত' পলট আয়েংগে হম্॥

অন্তিম ন্যায় দিবসে আমি বাদশাহী তেজে চলে যাব, আর আমায় যদি যথাযোগ্য জিজ্ঞাসাবাদ না করা হয়, তবে আবার ফিরে আসবো।

কিছুক্ষণ মুদিত চক্ষে থেকে চোখ খুলতেন সূর্যাপ্রসাদ :

—কার শের এটা ! যোশ মলিহাবাদী, না ?

মৌলবী সাহেবের উচ্চারণ সংশোধন করবার জন্যে সেই লাইন দুটোই তিনি আর একবার আবৃত্তি করতেন ; সমালোচনায় ভুল ধরতেন না।

হস্র মে ভী খুস্র্ বনা শান্ সে জায়েংগে হম্।

ঘাড় দুলিয়ে মৌলবী সাহেব তারিফ্ করে উঠতেন :

—বাহা-বাহা-বাহা-বাহা—ক্যা খুব !

রসের উৎসবে সূর্যাপ্রসাদ কোন ব্যবধান রাখতেন না। কিন্তু প্রবৃত্তি প্রতিপালনের সময় তিনি সাবধানে স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতেন।

সূর্যাপ্রসাদ উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। কিন্তু অনুদার বা স্বার্থপর ছিলেন না। পুত্রের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে মিতাক্ষরা আইন অনুসারে সব সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছিলেন। চুল চেরা সমান ভাগে। মহাদেও খেতনের অংশে ট্রাস্টি ছিলেন দাদীজী। আদালত থেকে তাঁকেই অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যাপ্রসাদ। নিজের ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল না। শ্রদ্ধা ছিল।

মহাদেও খেতনের বয়স বোধহয় তখন বছর নয়েক। হঠাৎ একদিন তাঁকে সূর্যাপ্রসাদ গোলাপবাগে ডেকে পাঠালেন। তার দিন কয়েক আগে মহাদেও খেতনের উপনয়ন হয়েছে। হাজার-হাজার নিমন্ত্রিতের মাঝে ইপ্সিত ব্যক্তিটিকে দেখা যায়নি। অভিমানে মহাদেও খেতনের চোখে জল এসেছে। কিন্তু কাঁদেন নি। সেই বয়সেই বুঝেছিলেন, অধিকারের বাইরে অশ্রুপাত করলে মান থাকে না।

আজ মাথা নেড়ে সবেগে প্রতিবাদ করলেন :

—ম্যা' কোনী জাউ দাদীজী—না, আমি কিছুতেই যাবনা।

দাদীজী বোঝালেন পিতার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে নেই, তাতে তাঁর সম্মান হানি হয়।

সেই প্রথম মহাদেও খেতন কালো ঘোড়ার জুড়িতে চড়লেন। সুদীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে রইলেন তিনি।

শীতের প্রত্যূষে সূর্যাপ্রসাদ বাগানের লনে বসে আছেন। চায়ের সময় তখন। তিনি একলাই। ছেলেকে বসতে বললেন না। শুধু টেবিলের ওপর থেকে একটা বড় রক্তগোলাপ তুলে নিয়ে উপনয়ন প্রসঙ্গে বললেন :

—আমি ত' ভুলেই গিয়েছিলাম!

তারপর গোলাপটি আস্তে-আস্তে পুত্রের কোর্টের বোতাম ঘরে গুঁজে দিয়ে বললেন :

—এবার যাও।

আসবার আগে খুব মৃদু স্পর্শ দিলেন মাথার চুলে। সেই স্পর্শে মহাদেও খেতনের গা যেন অবশ হয়ে গেল!

একটু বাল-সুলভ কৌতূহল নিয়ে মহাদেও খেতন চারিদিক দেখতে দেখতে ফিরে আসছেন। লনের ওধারে বাগানবাড়ী। ওখানে তিন-চারটি সুবেশা-সুন্দরী ঘোরা-ফেরা করছে। গাড়ীতে ওঠবার সময় সেই কথাই কোচ্‌বানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

—রহমৎ, ওরা কে! ঐ বাড়ীতে?

প্রশ্ন শুনে সহিস ছেদিলাল হাসলে। গাড়ীর দরজা বন্ধ করতে তার একটু দেরীও হয়ে গেল।

কোচবক্সে উঠতে উঠতে রহমৎ জবাব দিলে :

—হুজুর, আপকী আম্মা!

তার মুখ মহাদেও খেতন দেখতে পেলেন না। কিন্তু রহমতের কথার শেষের হাসিটা যেন আজও তাঁর কানে লেগে আছে!

চারটে দিয়ালী উৎসব কেটে গেছে। চারবার বড়া-হাবেলী, ছোটা-হাবেলীর জীর্ণোদ্ধার হয়েছে। চুণের কলি ফেরান হয়েছে চার বার। চম্পাবাঈর মৃত্যুর পর চার বার।

বড়া-হাবেলীর পাঁচ বিঘের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক তার পরই ছোটা-হাবেলী। বাড়ীটা এতদিন খেতন পরিবারের অতিথি-মহল রূপেই ব্যবহার করা হত। আজকাল এখানকার ব্যবসাগুলো উঠে যাওয়ার পর একরকম খালিই পড়ে থাকে।

সেদিন সকালে বড়া-হাবেলীর ফুল-বাড়ীতে পায়চারী করতে করতে মহাদেও খেতন চলে এলেন ছোটা-হাবেলীর ফটকের সামনে। হঠাৎ কি মনে হ'ল তাঁর। ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। চম্পাবাঈর কথা বড় বেশী করে মনে পড়ছিল সেদিন। ভোরের দিকে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে। কি দেখেছিলেন স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু চার বছরের ব্যবধানটা সেই মুহূর্তে অনেকখানি সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমনিই হয় তাঁর। কখনো ভুলে থাকেন দিনের পর দিন। এমন কি টানা এক দু'বছর। আবার কখনো চম্পাবাঈর স্মৃতি ঘন-ঘন তাঁর মনের অলি-গলিতে হাত বাড়াতে থাকে।

অন্যমনস্ক পায়ে মহাদেও খেতন ছাদে উঠে এলেন। নীচে কেউ ছিল

কিনা তাও লক্ষ্য করেননি। কিন্তু এই ভোরের কল-কাকলি ভরা আকাশের তলায় মনে হচ্ছে বাড়ীটা ভয়ঙ্কর রকম নির্জন। নির্জন বাড়ীতে তিনিও থাকেন। মানুষের কোলাহল বড়া-হাবেলীর ইঁট-কাঠের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছয় না। কিন্তু আজ চম্পাবাঈ তাঁর মনে সাড়া তুলেছে। তার রেশ ঘুরছে বড়া-হাবেলীর প্রতিটি কোণে। দু'তলায় তাঁর নিজের ঘরে। বারান্দায়। বাথরুমে। সর্বত্রই তিনি আজ চম্পাবাঈকে দেখেছেন।

কোথা থেকে যেন শব্দ ভেসে আসছে। মারোয়াড়ী গানের সুর। কান পেতে শুনলেন মহাদেও খেতন। চম্পাবাঈও মাঝে মাছে গুন্‌গুন্ করত। ভাল গাইতে পারত কি না বলা যায় না। সামনে বসে গায়নি কোনদিন। কিন্তু ঐ গুনগুনানিটুকু মহাদেও খেতন কাণ পেতে ধরবার চেষ্টা করতেন।

আজও কান পেতে শুনলেন। মনযোগ দিয়ে।

গোর এ গনগোর মাতা খোল কিবাড়ী
বাহর উবী রেঁায়া পূজন ওয়ালী—
ধোআ-ধোআ থাল পরোস দিয়া ভাত-জী,
আও-আও নাগরমল বৈঠনা সাথ-জী॥

গান শুনতে শুনতে মহাদেও খেতন পাঁচীলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। খুব দূরে নয়। এ বাড়ীর পেছনে রাস্তা, তার ওপারে ঝুনঝুন ও'লাদের বাড়ী। ও বাড়ীর একটি মেয়ের সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে। কার্ড এসেছিল মহাদেও খেতনের নামে। তিনি যাননি। কোনদিনই কোথাও যান না। ভীড় তাঁর সহ্য হয় না। মাথা গরম হয়ে ওঠে। তিনি যান নি। মুণিমজী নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছেন। তাঁর হাত দিয়ে মহাদেও খেতন উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মুণিমজী আজকাল কোথাও যেতে সম্মত হন না।

—বুড়ো বয়েসে আর তোমাদের তরফের লৌকিকতা করতে পারিনা, বাপু!

—আপনারও ত' নিমন্ত্রণ?

—হাঁ, কিন্তু এবার তোমার ঘাড়ে চড়বার সময় এসেছে। গিয়ে তুমিই

ত' বলবে নানাজীর শরীরটা ভাল নয়, তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও আসতে পারলেন না।

তবু যেতে হয়েছিল মুণিমজীকে। সম্পর্কে মাতামহ হলেও, মুণিম। আনুগত্যই এ'স্থলে প্রধানতম যোগ্যতা।

ঝুনঝুন ও'লাদের একতলা বাড়ীর আঙিনা এ বাড়ীর ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আঙিনা ভরা মেয়ে। অন্ততঃ গোটা পনেরো। সকলেই কুমারী। গণগোরী ব্রত উদ্যাপন করছে। ঝুনঝুন ও'লাদের যে মেয়েটির সদ্য বিবাহ হয়েছে সেই গণগোরীর মধ্যমণি। তাকে ঘিরেই সব কিছু। পূজো গান সবই তার মঙ্গলের জন্যে। অখণ্ড সৌভাগ্যবতী হবে মেয়েটি। যেসব কুমারীরা এতে অংশ নিয়েছে তাদের পতিভাগ্যও উজ্জ্বল। আঙিনার মাঝখানে পোঁতা অশথ-চারাটা দূর্বা-চন্দন-পুষ্পে মেয়েগুলি ভরিয়ে দিয়েছে। মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত বিরামহীন বেগে গেয়ে চলেছে।

ওদের মধ্যে একটি কুমারীকে দেখলেন মহাদেও খেতন। দলের সব চেয়ে বড়। বয়সের আঁচে মুখের কোমলতা ঝলসে গেছে অনেকখানি। বয়স প্রায় বছর কুড়ি। এ সমাজে এত বয়সের মেয়ে কুমারী থাকে না। কিন্তু মেয়েটির মুখে বয়সের এতখানি ছায়াপাত হবার হবার কথা নয়। মহাদেও খেতন ভাবলেন, হয়তো চারিদিকে ফুল ফুটতে দেখে ওর বসন্ত কুঁড়ি খেদে ঝলসে গেছে। তবু সুন্দরী। যে রূপ কোন বিপর্যয়ে নষ্ট হয় না, সেই ধরণের একটা রূপ আছে মেয়েটির।

মহাদেও খেতন তাকিয়ে রইলেন। কুড়ি বছর বয়সের চম্পাবাঈকেও ত' তিনি দেখেছেন! এঁকেও দেখছেন। খুব অমিল নেই কুড়ি বছরের চম্পাবাঈর সঙ্গে।

কেমন বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে শ্যামাবাঈর প্রতি মহাদেও খেতন আকৃষ্ট হলেন। হঠাৎ-এসে-যাওয়া চম্পাবাঈর স্মৃতি মুক্ত হতে বড় দেরী করছে এবার। ক্রমেই যেন মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। প্রায় একপক্ষ কাল ধরে রোজ তিনি দেখছেন শ্যামাবাঈকে। কেমন একটা কৌতূহল নিয়ে চম্পাবাঈর সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখছেন।

দূরে নয়। মোটেই দূরে নয় আজকাল। অতগুলি মেয়ের দৃষ্টি বাঁচিয়ে শ্যামাবাঈর সঙ্গে স্পষ্ট দৃষ্টি বিনিময় হয়। প্রথম প্রথম চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এখন তাকায়। মাঝে-মাঝে চোখের পলকপাত না হওয়া পর্যন্ত তাকিয়েই থাকে সে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মিলিয়ে দেখতে-দেখতে কোন এক স্থানে এসে চম্পাবাঈ আর শ্যামাবাঈ সম্পূর্ণ এক হয়ে দাঁড়ায়। আঙিনায় অতগুলি মেয়ের মাঝে তখন আর মহাদেও খেতন শ্যামাবাঈকে খুঁজে পান না। চম্পাবাঈ দৃষ্টি আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়ায়। তাকে অনুসরণ করে মহাদেও খেতন ফিরে আসেন বড়া-হাবেলীতে। দু-তলায় নিজের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে শ্যামাবাঈর কথা মনে করলেই স্পষ্ট বোঝা যায় চম্পাবাঈ এসে দাঁড়িয়েছে খাটের বাজুটি ধরে। মৃদু-মৃদু হাসছে যেন, ঘনিষ্ঠ হয়ে কাছে সরে আসছে।

ইতিমধ্যে দাদীজী একদিন বললেন:

—নাতৃ বৌ যায়নি। তার আত্মা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দেখেছি দু' একদিন। ঠাকুর ঘরে আমার পুজোর সময় পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক আগে যেমনটি দাঁড়াত।

—তুমি ঠিক দেখেছ দাদীজী?

—হাঁ, মুন্না!

মহাদেও খেতন চোখ তুলে দাদীজীর দিকে তাকালেন। চম্পাবাঈকে তিনি যেতে দেননি। তার রক্তের একটা অংশ দুটি পাত্রে ধরে রেখেছেন। কল্পনা আর মায়া। অনুভব করেন সে আছে। যেমন অনুভব করেন পৃথিবীর বুকে তাঁর অনেক কেনা মাটি আছে। এই বড়া-হাবেলী, ছোটা-হাবেলী, আরো দশ-বিশটা বাড়ী, কলকাতায় কটন্ স্ট্রীটের বাড়ী, গদী, কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশে খেতন-কুঞ্জ। বড়া-হাবেলী ছেড়ে তিনি বড় একটা কোথাও যান না, তবু যেমন অনুভব করেন এ'সব আছে, তেমনি অনুভব করেন চম্পাবাঈ আছে। কিন্তু তবু চম্পাবাঈকে তিনি একদিনও দেখেননি।

সেই কথাই বললেন দাদীজীকে:

—তুমি দেখতে পাও, দাদীজী! কিন্তু আমি পাই না কেন?

দাদীজী শঙ্কিত হয়ে উঠলেন :

—না, না, এ ভাল কথা নয়! বলতে নেই। যে গেছে সে গেছে—আমার তোরই জন্মে ভয় হয় মুন্না।

আশঙ্কায় দাদীজীর মুখ কালো হয়ে গেল। খানিক পরে বললেন :

এর একটা উপায় যা হ'ক করতে হবে। আজই গোপীনাথ পণ্ডিতকে ডাকছি আমি।

গোপীনাথ পণ্ডিত এলেন। তিন দিন অখণ্ড চণ্ডীপাঠ, প্রেতাত্মার শান্তির জন্য সত্র-স্বস্ত্যয়ন সবই হ'ল। শেষে বাড়ীর চার কোণে চারটি হুক পুঁতে দিয়ে গোপীনাথ পণ্ডিত উদাত্ত কণ্ঠনাদ করলেন :

—জয় কালি, কলকাত্তাবালী, ব্যস্।

এর পর আর দাদীজী দেখেননি চম্পাবাঈকে। কিন্তু মহাদেও খেতন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি অনুভব করেন সে আছে। জোর করে অনুভব করেন।

কিন্তু এ সবের মাঝেও রঙের রসায়ন-ক্রিয়া বন্ধ হয়নি। ব্যাহত হয়েছে অবশ্যই। তাতে মোড় ঘুরে অন্য পথে ধারা বয়ে গেছে। সোজাসুজি শ্যামাবাঈকে বিবাহ করতে ইচ্ছে হয়নি। তবু আলাপ করতে ইচ্ছে হয়েছে। শুধু চম্পাবাঈর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জন্যে।

সারা সকাল মারোয়াড়ী টোলার বাড়ী-বাড়ীতে টহল দিয়ে ফেরে বুড়া ঝামলাল। পুরুষ নয় নারী। কিন্তু যে বয়সে এসে নারী আর পুরুষের ব্যবধান ঘুচে যায়, সেই বয়স তার। সে বলে আরো বেশী।

—তোমার বয়স কত বুড়া ঝামলাল ?

—বয়েস! জানি না বাপু, তবে তোর দাদাজী-নানাজীকে কুল্পিবরফ কিনে খাইয়েছি। সর্দি মুছিয়ে দিয়েছি—তাই দিয়ে হিসেব করে নে ?

—আমার দাদাজী! তিনি ত' সাত বছর হ'ল মারা গেছেন আটাত্তর বছর বয়েসে ?

—তবে তার ওপর দু-কুড়ি বছর ধরে নে।

সঙ্গে দু-চারটে কচি-কাচা ছেলেপুলে ঘোরে। সব বাড়ীরই অন্দরমহল

তার পক্ষে অবারিত। যেদিন যেখানে খুশি ঢুকে যায়। গল্পগুজব করে। অতিরিক্ত গঞ্জিকা সেবনের ফলে গলার স্বর ভেঙে গেছে। খুব অভ্যস্ত কান না হলে কথার মানে ঠিক ধরা যায় না। বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্যে রক্তজবার কুঁড়ির মত লাল-লাল চোখ জোড়া ঠেলে বের করে চীৎকার করে শুধু।

দুপুরের দিকে রাস্তার ওপর মিষ্টির দোকানের সামনে খাটিয়া পেতে বসে নিজের মনে বক্-বক্ করে। পরিচিত পথচারী দেখলে গাঁজা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে পাশে বসিয়ে গল্প করে।

—শ্যামলিয়া, আজকাল এ রাস্তায় তোকে চলতে দেখি না যে?

—আমি তো রোজই যাই—তুমিই দেখতে পাওনা, বুঢ়া ঝামলাল।

—রোজ যাস্! আচ্ছা নে টান। দেখিস কল্কের কাপড়টা এঁটো করিসনি যেন, আলগোছে টান।

সেই বুঢ়া ঝামলালের সঙ্গে একদিন এ'ল শ্যামাবাঈ। দাদীজীর পূজার ঘরে।

—এটি কে বুঢ়া ঝামলাল?

স্ুঁচে সুতো পরাবার চেষ্টা করতে করতে দাদীজী প্রশ্ন করলেন।

—তুলারাম পাঁপড়-ওয়ালার বোন।

—কে তুলারাম?

কিছুতেই স্ুঁচের ছিদ্রে সুতো দিয়ে উঠতে পারছেন না দাদীজী।

—একে দাও মুন্নার দাদী, পরিয়ে দেবে।

নিমেষেই কাজ হয়ে গেল। দাদীজী শ্যামাবাঈর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঢ়া ঝামলালকে বললেন:

—বেশ মেয়েটি! কোথায় বিয়ে হয়েছে?

বুঢ়া ঝামলাল তিরিয়ে উঠল।

—এই ত' সেদিন হামাগুড়ি দিয়ে খাপড়ার বাড়ীতে শ্বশুর-ঘর করতে ঢুকলে, এর মধ্যেই চোখের মাথা খেয়েছ! আইবুড়ো আর বে'ওলা মে' চিনতে পার না?

দাদীজী হাসলেন :

—না বাপু পারিনা। তুমি না হয় মানুষ হয়ে পেত্নীর পরমাই পেয়েছ—মরেও মরনা, কিন্তু আমরা ত' আর তা' নই ?

বুঢ়া ঝামলাল হাসলে। বয়স নিয়ে ব্যঙ্গ শুনতে ভাল লাগে তার।

—আমি কি এখুনি যাব ! তোমার ছেরাদ্দর রান্না তাহলে কে রাঁধবে ? কিন্তু শ্যামাবাঈকে কেন এনেছি জান ? তোমার গোবিন্‌জীকে ও গান শোনাবে।

—গান জানে !

অবাক বিস্ময়ে দাদীজী মিট-মিট করে তাকিয়ে রইলেন।

—খুব ভাল জানে—ওর ভাবীর কাছে শিখেছে।

দাদীজী আরো বিস্মিত হলেন :

—এর ভাবী মারোয়াড়ী ?

—না, আংরেজ !

বুঢ়া ঝামলাল ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে জবাব দিলে। তারপর বললে :

—তুলারাম বাড়ীতে গান গাইতে দেয় না।

—কেন ?

—বলে মে' ছেলে গান গাইলে জাত চলে যায় !

—ওর বাড়ীতে গান হয় না বুঝি ?

—হয় না কেন ? মারোয়াড়ী গীত হয়। তুলারাম নিজে গায়।

বলে সুর করে গাইলে বুঢ়া ঝামলাল :

গোবিন্‌দা জয়, হারি গোপাল জয়-জয়।
জয় রাধা কৃষ্ণ, হারি গোপাল জয়-জয়।

দাদীজী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন :

—তুমি থাম বাপু—মড়াকান্না জুড়ে দিলে ! যারে গান শোনাতে আনলে সে গাইবে না ?

গান গাইলে শ্যামাবাঈ। সামনে গোবিন্‌জী। দাদীজী। বুঢ়া ঝামলাল। নেপথ্যে মহাদেও খেতন। কত জোরে গাইলে দু'জনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে ? আন্দাজ করে নিয়ে গান ধরলে শ্যামাবাঈ।

ঠাকুর বিদ্যাপতির সর্বজন বিদিত পদটি। প্রথমে খুব মৃদুস্বরে আরম্ভ করলে। তারপর কণ্ঠকে ছড়িয়ে দিলে ঘরের বাইরে।

দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥

তারপর থেকে মাঝে-মাঝে আসত শ্যামাবাঈ। ক্রমশঃ সেই মাঝে-মাঝের ব্যবধানটা সংক্ষিপ্ত হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে গেল। গোবিন্‌জীর সেতু বয়ে আসার এই রাস্তাটা অত্যন্ত মনঃপুত হয়েছে শ্যামাবাঈর। তার আচরণের ফাঁকে কারও কোন সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কিন্তু তবু নিজের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে শ্যামাবাঈ। প্রণয় ব্যপারে এতটা সাবলিল তাকে কে করে দিল! নারীত্বের নিষ্ক্রিয়তার নিয়ম লঙ্ঘন করে কি করে এগিয়ে যাচ্ছে সে। শুধু কি বেশী বয়স পর্যন্ত বিবাহ হয়নি বলে? না অন্য কিছু? হঠাৎ তার মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে!

—আমি আর কাল থেকে আসতে পারব না দাদীজী।

—কেন রে! আসবি না কেন?

দাদীজী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

—এমনিই।

গম্ভীর হয়ে গেল শ্যামাবাঈ।

—তবে কিন্তু না এলে ভারী রাগ করব।

দাদীজী স্নেহমাখা কপট ক্রোধের ভান করে বললেন।

দু' চারটে কথার মধ্যেই শ্যামাবাঈর মনের অবোধ্য অস্থিরতা কেটে যায়। তবু সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারে না। চুপ করে বসে থাকে আবার।

মহাদেও খেতন ঘরে ঢুকলেন। গোবিন্‌জীকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন একপাশে। শ্যামাবাঈকে উদ্দেশ্য করেই দাদীজীকে প্রশ্ন করলেন:

—দাদীজী, আজ বুঝি তোমার গোবিন্‌জীর গান শোনবার ইচ্ছে নেই?

দাদীজী সকৌতুকে তাকালেন। হয়ত তাঁর মনে একটা বাসনার ছায়াপাত হয়েছে; কিন্তু খেতন বংশে একটা সাধারণ পাঁপড়ওয়ালার বিশ

বছরের ধাড়ী মেয়েকে আনবার কথাটা মনের মধ্যে উঠেও কিসের চাপে যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু জিহ্বার প্রলোভনটা সংযত বাসনার তলায় চাপা দিতে পারলেন না।

—পাথরের গোবিন্‌জীকে শ্যামাবাঈর আর গান শোনাতে ভাল লাগছে না, তাই ও রক্ত-মাংসের গোবিন্‌জীর জন্যে বসে আছে। সে এসেছে—এইবার গান হবে।

—দাদীজী

চাপা তর্জন করে শ্যামাবাঈ আরক্তিম মুখখানা ঘুরিয়ে নিলে। মহাদেও খেতনের বেশ লাগল এই ভঙ্গিটা। চম্পাবাঈও মাঝে-মাঝে এমনি করত। শ্যামাবাঈর উত্তাপ আছে। রক্ত-মাংসের শরীরে চাঞ্চল্য আছে তার। শুকনো পাতার ভেতর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ভালবাসার আঁচ লাগলেই জ্বলে উঠবে। শিখায় শিখায় জড়িয়ে পড়বে মহাদেও খেতনের দেহমনে।

দাদীজীর আদেশ-অনুরোধে গান আরম্ভ করলে শ্যামাবাঈ। তার কণ্ঠে আজ যেন অপার্থিব মিলনের সুর ফুটে উঠেছে। সমস্ত দেহে, প্রাণোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, পরিপূর্ণ জীবনের ইসারা। চম্পাবাঈ! মরেনি চম্পাবাঈ। এক দেহ থেকে আর এক দেহে তার সমস্ত সত্তা আশ্রয় করেছে। তাই নতুন করে বিস্তৃততর পরিচয়ের অপেক্ষা না করেই মহাদেও খেতনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে শ্যামাবাঈ।

সুরের মোহে দাদীজীর সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সমাধি লাভ করেছেন যেন! অচল-অনড় দেহ থেকে প্রাণের সমস্ত চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে গেছে। গিয়ে মিশেছে গোবিন্‌জীর সিংহাসনের নীচে, তাঁর পা দুটিকে আশ্রয় করে।

একান্ত আচম্বিতে শ্যামাবাঈর পিঠে হাত রাখলেন মহাদেও খেতন। তারপর অতি সন্তর্পণে নীচু হয়ে তার হাত ধরলেন। ওপরের দিকে আকর্ষণ করলেন। শ্যামাবাঈকে। চম্পাবাঈকে!

মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্যামাবাঈ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ঢাকা দালানের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে।

শ্যামাবাঈ মৃদু আপত্তি করলে:

—ছোড় দে কোঈ দেখ লেগা!

—লেগা তু' লেগা, তু মেরী লুগাঈ!

দেখুক, তুমি আমার বউ। মিথ্যে বলেননি মহাদেও খেতন। বারো-তেরো বছর আগেকার সেই লগ্নটি যেন আজ এই মুহূর্তে আবার ফিরে এসেছে। চম্পাবাঈর ব্রীড়ায় শ্যামাবাঈর মুখ লজ্জাবনত। আরক্তিম।

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন মহাদেও খেতন। কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করে শ্যামাবাঈ হাত ছাড়িয়ে নিলে। ঠাকুর ঘরে আর ঢুকল না। দালানের মোড় ঘুরে চলে গেল অন্যদিকে। খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বোধ হয়!

—নঁহী, নঁহী, নঁহী, মুঝে ছোড় দো—ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও।

রাত তখন কত? কিন্তু শুক্লাষ্টমীর চাঁদ ডুবে গেছে—অনেকক্ষণ আগে। হঠাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেছে মহাদেও খেতনের। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। একবার মনে হল চোর। পরমুহূর্তে মনে হল ভূমিকম্প। মেয়ে দুটোর কথা তখন মনে পড়ল হঠাৎ। ছুটে যেতে গেলেন তাদের ঘরের :দিকে। নিশ্চিন্ত ঘুমের রেশটা কাটতে আরম্ভ করেছে ততক্ষণে। জড়তা কেটে গেছে। ছুটতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, চোর নয়। ভূমিকম্প নয়। ফটকের কাছে নারীকণ্ঠে কে যেন আতুর চীৎকার করছে। জানালা দিয়ে আবক্ষ ঝুঁকে পড়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারা গেল না। শুধু দেখলেন লোক—দু'একজন নয়, অনেক লোক।

ওপর থেকে হাঁকলেন মহাদেও খেতন:

—লছমন, লছমন পাঁড়ে।

সাড়া পাওয়া গেল না। অন্যান্য ভৃত্যদের নামও মনে পড়ল না সে সময়টা। অগত্যা নীচে নামলেন। চলে এলেন ফটকের কাছে।

এসে বিস্ময়-মূক হয়ে পড়লেন মহাদেও খেতন। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। চোখের সামনে একটা অদ্ভুত অসঙ্গতি দেখে ভেতর ভেতর ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত লছমন পাঁড়েই তাঁর কাছে এগিয়ে এল:

—কুছ নঁহী হুজুর! পাগলী হো গয়ী বিচারী! ঘর সে ভাগকর য়ঁহী ঘুসনা চাহতী হ্যায়।

মহাদেও খেতনকে উদ্দেশ্য করে কে যেন লছমন পাঁড়েরই কথার উত্তর দিলে:

—পাগলী! পাগলী নঁহী জী, হাওয়া হ্যায়। লছমন ত' হাওয়া কা জি হ্যায় না?

এবার নিজের মনের ভেতর থেকে কিসের যেন ইঙ্গিত পেলো মহাদেও খেতন। অসঙ্কোচে এগিয়ে গিয়ে শ্যামাবাঈর হাত ধরে তাকে ভীড়ের একপাশে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

উজ্জ্বল উগ্র দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে একবার তাকায় শ্যামাবাঈ। সঙ্গে সঙ্গে যেন এক অদ্ভুত কোমলতায় তার সর্বাঙ্গ ভরে উঠল। চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে গেল তার। বিলোপ বিনম্র চোখে একবার তাকাল মহাদেও খেতনের দিকে।

কিন্তু বিদ্যুতের দাগের মত সে স্বল্পস্থায়ী বিনম্রতা যেন একটা বিভীষিকার মধ্যে হারিয়ে গেল! আবার আগের মত চীৎকার করে ছুটে ফটকের বাইরে চলে গেল শ্যামাবাঈ।

—ছোড় দো মুঝে, ছোড় দো, ছোড় দো—

কোলাহল স্ফীত বাড়ীখানা মধু নিংড়ে নেওয়া চাকের মত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তারই মধ্যে অন্ধকারে কেন্দ্রবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন মহাদেও খেতন। নিজের বুকের শব্দটি পর্যন্ত তখন শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

সেই শব্দই মনে মনে গুণছিলেন:

—এক—দুই—তিন—

এগারো পর্যন্ত গণনা হওয়ার পর মনে পড়ল সেদিনকার সেই ঘটনার পর আজ এই এগারো দিন পরে অতি নাটকীয় একটা দৃশ্যের দর্শক হয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু কি দেখলেন, কেন দেখলেন, তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

মেলাতে ছোট্ট একটা কাঁচের টুকরোর মধ্যে দিল্লীর দরবার দৃশ্য দেখায় —সামান্যের মধ্যে সামগ্রিকতা! আর আজ এত বড় দৃশ্যপটে যে যৎসামান্য ঘটনার ছবি দেখলেন তার সবটাই দুর্বোধ্য!

হয়তো সারা রাতই দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ দাদীজী এসে ডাকলেন :

—মুন্না।

চকিত স্বরে সাড়া দিলেন মহাদেও খেতন :

—দাদীজী!

—মুন্না, রাত শেষ হয়ে আসছে, শুয়ে পড়গে যা।

—আর একটু থাকি দাদীজী?

ছোট ছেলের মত আব্দার করলেন মহাদেও খেতন।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন দাদীজী :

—না, না, শ্যামাবাঈর হাওয়া লেগেছে, ভুতে ধরেছে ওকে, অন্ধকারে একলা থাকে না।

এসে হাত ধরলেন দাদীজী!

—যা বাবা, কথা শোন!

পরদিন সকালে বিস্তৃততর খবর পাওয়া গেল। বুঢ়া ঝামলাল সংগ্রহ করে এনে দাদীজীকে জানিয়েছে। ভর হয় রাজকুমার বাবুর ওপর। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি শ্যামাবাঈর কাকা। তার ওপর স্বর্গত আত্মীয়-স্বজনের আত্মার ভর হয়। আবির্ভূত হয়ে নানারকম নির্দেশ দেয় তারা। তাদেরই কে নাকি বলেছেন, শ্যামাবাঈর হাওয়া লেগেছে। বিকানীরের যে ছেলেটির সঙ্গে শ্যামাবাঈর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল তারই অতৃপ্ত প্রেতাত্মা নাকি শ্যামাবাঈকে ধরে নিজের অতৃপ্ত বাসনা পরিতুষ্ট করছে।

এত কথা জানতেন না মহাদেও খেতন। ভূত-প্রেতের কথাগুলো বাদ দিয়ে এইটুকুই বুঝলেন যে, শ্যামাবাঈর বিবাহ স্থির হয়েছিল কোনকালে। কিন্তু বিবাহ হয়নি। সেই কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কের মত বলে ফেললেন তিনি :

—তাকে এখানে আনা যায় না দাদীজী?

—যায় না কেন! আমি ডাকলে তাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে।

অন্য সময়ের কথা হলে দাদীজী কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করতেন বলা

যায় না। কিন্তু আজ তাঁর মনে কোন বিরূপ ভাব বা সন্দেহের উদয় হ'ল না। ভূতগ্রস্তা মানবী, রক্ত-মাংসের নারীর পর্যায়ে পড়ে না। আর তার বোধশক্তি থাকে না, নিপীড়িত করলে লাগে না। তার সঙ্গে একান্তে কথা বললে দোষ হয় না। তবে সাবধান হওয়া ভাল। হাওয়াকে বিশ্বাস নেই, তারা খেয়াল খুশি মত আধার পরিবর্তন করে। সেদিক দিয়ে দাদীজী সাবধান করে দিলেন!

মৃদু হাসলেন মহাদেও খেতন!

—আমার শরীর ত' তুমি, দাদীজী, তামার মাদুলীতে বেঁধে রেখেছ?

হাঁ, দাদীজীরও মনে পড়ল, মন্ত্রে-মাদুলীতে তিনি পৌত্রের সর্বাঙ্গ বেঁধে রেখেছেন। মাঝে মাঝে সে বন্ধন ঝালিয়েও নেন। ভয়ের কিছু নেই, তবু কিন্তু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।

অগত্যা নিজের মনেই উপায় স্থির করে নিলেন দাদীজী, গোপী পণ্ডিতকে ডাকবেন তিনি। তার সামনে কথা বলুক তাঁর পৌত্রটি। যত খুশি বলুক। তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু আর একটি দ্বিধা তাঁর মনে ভীতির শেকড় জড়ালে হঠাৎ। গত রাতের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে একবার নৃত্য করে গেল। শ্যামাবাঈর কি রূপ তিনি তখন দেখেছেন! দশমহাবিদ্যার পরিপূর্ণ শক্তি যেন তখন তার মধ্যে এসে গিয়েছিল। মেয়ে-ছেলের শরীরে অত বল তিনি কল্পনাতেও কোনোদিন ভাবতে পারেননি। এখন মনে হচ্ছে, সে সব স্বপ্ন। দশ-পাঁচটা নারীপুরুষ হিম্-সিম্ খেয়ে গেছে তবু তাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি। কে একজন যেন প্রহারও করেছিল তাকে। কে? অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারেননি কে!

অন্যমনস্কভাবে দাদীজী ঘাড় নেড়ে জবাব দিলেন:

—না মুন্না, ভেবে দেখলুম—শ্যামাবাঈকে আমি ডাকতে পারব না।

না, না—দাদীজী ঘাড় নাড়লেন ঘট্ ঘট্ করে। তারপর কিছুক্ষণ মহাদেও খেতনের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির অর্থ অনুমান করতে কষ্ট হল না মহাদেও খেতনের। তাতে আর যাই যাক নারীর প্রতি পুরুষের আসক্তি সম্বন্ধে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সন্দেহ-সঙ্কুচিত ভ্রূকুটি ছিল না।

আশ্বস্ত হলেন মহাদেও খেতন। মনস্থির করে ফেললেন তিনি ডাকতে হবে শ্যামাবাঈকে। কথা বলতে হবে তার সঙ্গে। খানিকটা বরফ-গলা জল হঠাৎ কিসের উত্তাপে ফুটে উঠল জানতে হবে সে কথা!

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। দাদীজী আসেননি এ' ঘরে। বড় একটা আসতেনও না কোনদিন। শ্যামাবাঈর খবর আর পাওয়া যায় নি। হয়তো তার উন্মাদনা শান্ত হয়েছে। বিকানীরের প্রেতাত্মার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়েছে। কিম্বা হয়ত এর বিপরীত কিছু একটা হয়ে থাকবে। কিছু জানা যায় না। ভেতর ভেতর মহাদেও খেতনের আত্মাও ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, তারপর খাঁচায় মরে থাকা পাখীর মত সব ছটফটানি স্তব্ধ হয়ে যায়। তবু বন্ধন ঘোচে না।

ভাবেন মহাদেও খেতন। বড় ঘরে জন্মানোর জ্বালা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন। কেনা মাটির বাইরে পা ফেলবার অধিকার নেই। এর সামান্য ব্যতিক্রমে সমস্ত দেহটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। মন সঙ্কুচিত হয়। অবস্থার মাপে মন তৈরী হয়ে গেছে—মনের মত করে আয়োজন করবার সাধ্য নেই তাঁর।

একদিন সেই কথাই বলে ফেললেন বাংলার মাষ্টার মশাইকে। এখনো তিনি মাঝে মাঝে আসেন। নিয়মিত পেন্সনের ব্যবস্থা আছে তাঁর। তবু নিয়মিত আসেন না। কারণ জিগ্যেস করলে বলেন না কিছুই।

আবার কখনো বা নিজে থেকেই বলেন :

—তুমি আছ মহাদেব, তাই আসি। প্রকৃত পাওনা যেখানে নেই, সেখানে পেন্সনের নামে নিয়মিত ভিক্ষা নিতে লজ্জা হয়।

সসঙ্কোচে প্রতিবাদ করেন মহাদেও খেতন :

—ও কথা বলবেন না, মাষ্টারমশাই। আপনি আমায় ক'খানা বাংলা বই পড়িয়েছেন তার হিসেব আমি কোনদিনই করিনি। শুধু একটা কথাই আমার মনে আছে, আপনি আমায় ভালবাসতেন। আজও বাসেন। এছাড়া আমার কোন কিছুই মনে পড়ে না। মানুষের ঋণ আমি স্বীকার করি না। পিতামাতার ঋণও মানি না। শুধু যারা আমায় ভালবাসে

তাদের কথাই মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আসবেন মাঝে মাঝে—আমার ত' যাওয়ার উপায় নেই।

মাষ্টার মশাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ফেলেন :

—কেন? অবশ্য আমার বাড়ীতে তুমি বসবেই বা কোথায়?

মহাদেও খেতন হাসেন। হাসতে হাসতে চোখে জল এসে পড়ে।

—খেতন পরিবারের কেউ কোনদিন কারো আতিথ্য নেয়নি মাষ্টারমশাই। আমার বাবা আশ্রিতা রাখতেন, কিন্তু কোনদিন কোন নারী মনে আশ্রয় নেবার স্বপ্ন দেখেননি। তাঁর ধারণা ওতে পুরুষত্ব বিকিয়ে যায়!

—কিন্তু তুমি ত' শিক্ষিত মহাদেও।

মহাদেও খেতন কথাটা শুনে আবার হাসলেন :

—তাই নিজেদের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখাতে পারি। তাছাড়া মাষ্টার মশাই, আপনারই ত' বলেন, পুঁথি পড়া শিক্ষা কিছু নয়। আমাদের জুতোর মাপে পা—পায়ের মাপে জুতো নয়। আমাদের মনের আভিজাত্য নেই, আভিজাত্যের মাপে আমরা মন তৈরি করে নিই। চীনে মেয়ের বিকৃত পায়ের মতই আমাদের মনও বিকৃত।

তারপর একটু থামেন মহাদেও খেতন। ভাবেন আর বলবেন না। কিন্তু কে যেন মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ডটাকে চাপ দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত বলতেই হয় তাঁকে :

—আমি এর ব্যতিক্রম করবার চেষ্টা করেছি। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসতুম, সে চলে গেল। তারপর শ্যামাবাঈ—সেও পাগল হয়ে গেল।

শেষের কথাগুলো বলবার সময় মহাদেও খেতনের দৃষ্টি আভূমি নত হয়ে পড়ল। মাষ্টার মশায়ের দিকে আর চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু তাঁরই কথা ভাবছিলেন তখন।

একবার প্রায় মাস খানেক জ্বরে ভুগেছিলেন মহাদেও খেতন। তাঁর রোগ শয্যায় হিন্দী, ইংরেজীর মাষ্টার মশাই, উর্দুর মৌলবী সাহেব আসতেন রোজ। ভগবানের কাছে তাঁর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করতেন। আল্লার দরবারে দোয়া যাচ্ঞা করতেন। বাংলা মাষ্টার মশাই আসেন নি একদিনও। দাদীজীর দৃষ্টিতে তাঁর এ অনুপস্থিতি ধরা পড়েছিল।

মনে মনে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন তিনি। পৌত্রের নিরাময়ের পর সব শিক্ষকদের উপঢৌকন দিয়েছিলেন—সোনার বোতাম, আংটি। সিধা পাঠিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ী-বাড়ীতে। বাংলা মাষ্টার মশাইকে দেননি কিছু। শুধু পৌত্রকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মাষ্টার পড়ায় কেমন?

মহাদেও খেতন উত্তর দিয়েছিলেন:

—সব চেয়ে ভাল।

উত্তর শুনে দাদীজী খুশি হন নি।

অসুখ থেকে ওঠার পর মহাদেও খেতন যেদিন প্রথম পড়তে গেলেন সেদিনও মাষ্টার মশাই জিজ্ঞাসা করেন নি, কেমন আছেন তিনি। শুধু পড়ানর সময়টা একটু সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন। মহাদেও খেতন উঠে আসছিলেন।

মাষ্টার মশাই ডাকলেন:

—মহাদেও শোন?

মহাদেও খেতন ফিরে আসতে বললেন:

—আজ আর বাড়ীর পড়া দিলাম না। যাও, এখন বিশ্রাম কর।

আনত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বসে থেকে মহাদেও খেতন যেন সেই রোগশয্যার ছবি আর তার পরবর্তী কয়েকটা দৃশ্য ঘরের মেঝের ওপর দেখতে পেলেন। মনে হল ঘটনাগুলো ঘটল এইমাত্র। সময়ের পর্বত প্রমাণ ব্যবধান হঠাৎ কিসের স্পর্শে ধূলিকণার মত উড়ে যায় সে কথা ভাবতে গেলে মহাদেও খেতনের মাথা গরম হয়ে ওঠে। অন্য কিছু ভাল লাগে না। শৈশবটাকে তখন রক্ত-পলাশের ডালে টাঙিয়ে রাখা খুশির দোলনার মত মনে হয়। এর দড়ি ছাড়তে মন চায় না।

মাষ্টার মশাই ডাকলেন। ঘুম থেকে ডেকে তুললেন যেন!

—এবার যাই মহাদেও?

শুধু এইটুকু! কৌতূহল দেখালেন না। সান্ত্বনা দিলেন না। মুখ জোড়া বলিরেখার অন্তরাল থেকে এক জোড়া গভীর দৃষ্টি বেরিয়ে এসে মহাদেও খেতনের সর্বাঙ্গে গভীরতর দৃষ্টি বুলিয়ে দিলে। অনির্বচনীয় শান্তিতে ভরে উঠলেন মহাদেও খেতন। নীরবে মাষ্টার মশাইকে ফটক পর্যন্ত অনুগমন করলেন তিনি।

আষাঢ় মাস। দুপুর বেলা আকাশটা মেঘের ভারে জানালার পাশে শিশু গাছটার মাথায় এসে ঠেকেছে। বৃষ্টি আসবে এখুনি। দাদীজী কিছুক্ষণ আগে 'ছাপা' অর্থাৎ খবরের কাগজটা দিতে আসার ছুতোয় গল্প করে গেছেন। সোফা ছেড়ে তাঁর ওঠবার ইচ্ছে ছিল না।

অগত্যা বিরক্ত হয়ে মহাদেও খেতন নিজেই বলেন:

—তুমি এবার যাও দাদীজী, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।

—আহা! ঘুমো, ঘুমো—

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন দাদীজী।

খবরের কাগজখানা না খুলেই বিছানার এক পাশে ফেলে রেখে মহাদেও খেতন তাকিয়ে ছিলেন জানালার বাইরে। মেঘের আকর্ষণে আকাশ ক্রমশই মাটির বুকে নেমে আসছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে দু'এক ফোঁটা করে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মহাদেও খেতন। স্বপ্ন দেখছিলেন দেয়ালের গায়ে ঠক্-ঠক্ করে হুক পুঁতছেন। চম্পাবাঈর একখানা তেলরঙা ছবি টাঙাবেন।

ছবির দিকে দৃষ্টি রেখে মহাদেও খেতন হুক পুঁতছেন, হঠাৎ অন্যমনস্ক হেতু হাতুড়ির ঘা পড়ল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাথায়। কাৎরে উঠলেন তিনি। ঘুমটাও ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অনুভব করলেন, ভেতরের দালানের দিক থেকে ঘরের দরজায় কেউ অতি ব্যস্ততায় ঘা দিচ্ছে। কড়াও নাড়ছে মাঝে মাছে। দরজার দিকে তাকালেন মহাদেও খেতন। ছিটকিনি খোলাই আছে।

হয়তো দাদীজী, মহাদেও খেতন ডাকলেন:

—ভেতরে এস, দরজা খোলা আছে।

দরজাটা তখুনি খুলে গেল। সবেগে ঘরে ঢুকল শ্যামাবাঈ। বিস্রস্ত বেশ। আষাঢ়ে মেঘের কালি লেপে আছে সর্বাঙ্গে। বাঁ চোখের নীচ থেকে সেদিককার কর্ণমূল পর্যন্ত একটা কালশিরার দাগ। মাথার চুলগুলো কাঁধের চেয়ে উঁচু পর্যন্ত কপচে কাটা। চোখের দৃষ্টি, না, সেদিকে ভাল করে তাকাতে সাহস হল না মহাদেও খেতনের।

অন্যদিকে মহাদেও খেতন মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। বুকের ভেতর ভয়ের একটা জ্বলন্ত ত্রিশূল যেন ছ্যাঁকা দিচ্ছে। তবু তাঁর কণ্ঠের বিস্ময় ঢাকা পড়ল না, এপাশে মুখ ঘুরিয়ে বললেন:

—তুমি!

বলতে বলতে বিছানার ওপর উঠে বসলেন মহাদেও খেতন।

উত্তর দিলে শ্যামাবাঈ। সে এক বিচিত্র কণ্ঠস্বর। ভয় আর বিশৃঙ্খল বিক্রমের সংমিশ্রণে কতকগুলো শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। অশ্রুতপূর্ব বাচনভঙ্গী। ইতিপূর্বে মহাদেও খেতন উন্মাদ কখনো দেখেন নি। রাস্তায় উলঙ্গ-পাগল দেখেছেন, কিন্তু সে দেখা অন্য দেখা। সম্বন্ধহীন দৃষ্টিতে দেখা আর এ দেখায় পার্থক্য অনেক।

টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে শ্যামাবাঈ বললে:

—ওরা আমায় আসতে দেয় না। মারে। আমি তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

ভেতর থেকে যেন কতকটা সাহস পেয়ে মহাদেও খেতন ডাকলেন:

—এস এখানে সরে এস। কিন্তু আমায় কি বলবে তুমি!

—কি বলব জান না?

শ্যামাবাঈর স্বরে উষ্মা দেখা যায়। হঠাৎ পাশের টেবিলের ওপর থেকে গ্রানিটের ভারী কাগজ চাপাটা তুলে নিয়ে মহাদেও খেতনের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় সে। পাথরখানা জানালার চৌকাঠে প্রতিহত হয়ে ঘরের মেঝের ওপর ঠিকরে পড়ল।

ডুকরে কেঁদে ওঠে শ্যামাবাঈ:

—না, না, তোমায় মারিনি! তোমায় মারিনি—

বিছানা ছেড়ে মহাদেও খেতন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। শ্যামাবাঈর অদ্ভুত আচরণে মনে হল তাঁর বুকের মধ্যে যেন একটা করুণা-শ্যামা বনভূমি রচিত হয়েছে। আহা! কাছে আসুক মেয়েটা। কি বলতে চায় বলুক।

শ্যামাবাঈর দিকে এগিয়ে গেলেন মহাদেও খেতন। দরজা-জানালা উন্মুক্ত। তবু অসঙ্কোচে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শ্যামাবাঈকে। তাঁর চোখের কোণগুলো ভিজে উঠল।

অনেকক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। আলিঙ্গনাবদ্ধ শ্যামাবাঈ

পরম নির্ভরতায় বুকের ওপর মুখ ঘসতে লাগল। আরামের শিহরণে ফুলে-ফুলে উঠছে শ্যামাবাঈ। তার স্তবকহীন নাতিদীর্ঘ চুলে রুক্ষতার জটা পড়েছে। আস্তে আস্তে মহাদেও খেতন জটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তারপর শ্যামাবাঈর মুখ দু'হাতে ওপর দিকে তুলে ধরলেন তিনি। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। বিনা দ্বিধায় একটি চুম্বন রেখা এঁকে দিলেন চোখের নীচের কালো শিরার ওপর। শ্যামাবাঈ আপত্তি করলে না। সঙ্কুচিত হল না একটুও।

মুহূর্ত কয়েক পরে নিজেকে ছ ড়িয়ে নিয়ে শ্যামাবাঈ একটু দূরে সরে দাঁড়াল :

—তোমায় আমি সব বলব।

—হাঁ সব বল।

তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন মহাদেও খেতন।

ঘরের মেঝে থেকে কাগজ-চাপাটা কুড়িয়ে এনে সেটিকে যথাস্থানে রেখে দাঁড়িয়ে রইল শ্যামাবাঈ। আর তাকে মহাদেও খেতন বসতে বললেন না। নিজে চুপ করে বিছানার একটি কোণে বসে পড়লেন।

সেই আলিঙ্গন-চুম্বন যেন মিশে রয়েছে মহাদেও খেতনের অঙ্গে-অঙ্গে। বাহুদুটোর মধ্যে তড়িৎ-ক্রিয়া বোধ হচ্ছে। সুড়-সুড়ে পিঁপড়ে চলছে ঠোঁটের ওপর। অথচ মনে বিকার জাগেনি এক তিল-ও। শ্যামাবাঈকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর ভাল লেগেছে কিনা বুঝতে পারলেন না। অনুভূতিগুলো সুখের না অস্বস্তির তা ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু শ্যামাবাঈর ভাল লেগেছে জেনে সুখাতীত পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন তিনি। সহস্র লোকচক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি এ আলিঙ্গন দিতে দ্বিধা করতেন না। নারী দেহের স্পর্শে এই প্রথমবার মহাদেও খেতন কিছুই পেলেন না—কিন্তু এই না-পাওয়াটাই যেন আজ তাঁকে পরিপূর্ণ করল।

লজ্জার গণ্ডীর বাইরে সেদিন দু-জনেই গিয়ে পড়েছিলেন। মহাদেও খেতন আর শ্যামাবাঈ। শ্যামাবাঈর বোধশক্তি বিশেষ কিছু ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু সে সময়টা সে মহাদেও খেতনকে এমন এক আত্মীয়ের মত মনে করছিল যে সম্পর্কে ব্রীড়া আছে কিন্তু কুণ্ঠার আবরণ নেই।

অনেকক্ষণ ছিল শ্যামাবাঈ। টুকরো-টুকরো মেঘ আর সন্ধ্যার অন্ধকারের পুঁজি মিলিয়ে এক হয়ে যাওয়ার পর সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আলো জ্বালা হয়নি। ইচ্ছে করেই জ্বালেননি মহাদেও খেতন। সব কথা বলতে এসেছিল শ্যামাবাঈ। দুপুরের শেষাংশ থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যার প্রথম অধ্যায়ে এসে শ্যামাবাঈ তার গল্প শেষ করেছিল। অনেক জায়গায় তাল কেটেছে। অস্থির মস্তিষ্কের অসংলগ্নতা দু'চার স্থানে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে। আবার সেগুলোকে কোন-রকমে জোড়াতালি দিয়ে উপসংহারে পৌছবার চেষ্টা করেছে। কথা বলতে বলতে নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেছে শ্যামাবাঈ। মহাদেও খেতনকে ভুলে গেছে। তাই আলো জ্বালে নি সে। নিজের ইতিহাসের দ্রুতপঠনে ব্যস্ত ছিল শ্যামাবাঈ, মহাদেও খেতনের অস্তিত্ব হয়ত কাঁটার মত বিঁধত তাকে।

সেদিন কি বললে শ্যামাবাঈ—সব কথা ঠিক্-ঠিক্ মনে পড়ে না। যতটুকু মনে পড়ে তা নিজের মনে মহাদেও খেতন গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। সেদিন শ্যামাবাঈ তার ভাষার অস্পষ্টতা ভাব-ভঙ্গীর বোঝায় পূর্ণ করেছিল। সে ভাবগুলোকে ভাষায় বাঁধা যায় না তবু মনে করবার চেষ্টা করেন মহাদেও খেতন।

দুপুরের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পড়ন্ত বিকেলে মেঘমুক্ত আকাশের পশ্চিম কোণে এক টুকরো লাল রঙের সূর্য দেখতে পেয়ে ছাদে উঠে এসেছিল শ্যামাবাঈ। মন তখন রঙীন কিছু দেখলেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। নির্জনে দাঁড়িয়ে সেই রঙের নেশায় ঝিমুতে ইচ্ছে করে যেন।

পাশের বাড়ীর রমা এসেছিল। কাজের অছিলায় শ্যামাবাঈ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

ভাবীজী একবার ডাকতে এসেছিল :

—চল্, খান কয়েক রুটী বেলে দিবি।

তাকেও ফিরিয়ে দিয়েছে শ্যামাবাঈ :

—তুমি করে নাও ভাবীজী, আজ আমার ভাল লাগছে না।

ভাবীজী তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে কিন্তু তবু যাবার সময় একটা মুখরোচক ঠাট্টা করে গেছে :

কমলের কলেজ যাবার সময় হয়ে গেছে বুঝি ?

—ভাবিজী, তুমি কি !

উত্তরে একটু হেসে ভাবীজী নীচে নেমে গেছে।

দু-চারখানা বাড়ীর পর ওদের বাড়ী। কমল সন্ধ্যা কলেজে কমার্স পড়ে। বেশ ছেলেটা। ভাবীজী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের রেশমী সুতো দিয়ে তার সঙ্গে শ্যামাবাঈর একটা কাল্পনিক সম্বন্ধ বেঁধে দিয়েছে।

কমল শর্মা—ব্রাহ্মণ, কৌতুক করার পক্ষে নিরাপদ আধার। কারণ বাস্তব ওখানে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস কোনদিনই করবে না। সে কথা জানে শ্যামাবাঈ। ভাবীজীও জানে। তাই নির্ভয়ে তামাসা করে কমলকে নিয়ে।

তবু কমল—কমল। তার নামের কোমলতা শ্যামাবাঈকে একটু স্পর্শ করেছিল, সে কথা শ্যামাবাঈ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ভাবীজীর মুখে ঐ নামটার আবৃত্তি আর পুনরাবৃত্তি থেকে তার মনে নারীত্বের প্রথম চৈতন্য এসেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়, তখন কমলের নাম শুনলে নিজের বেশ-বাস গুছিয়ে নিত শ্যামাবাঈ! আলগোছে কপালের একপাশে কোঁকড়া চুলের একটা পাতলা গুছি নামিয়ে আনত।

কিন্তু জানত অসম্ভব। এর বেশী এগুলে ভাইজী দু'টুকরো করে কেটে ফেলতেও দ্বিধা করবে না। তবু তার জন্যে মন ব্যস্ত হয়নি। পরিণামের ইঙ্গিত যেখানে স্পষ্ট, সেখানে চট্ করে ভুল হবার ভয় থাকে না।

সব জেনেই মনে মনে প্রস্তুতি চলত শ্যামাবাঈর। কমলের নামের আয়নায় অন্য কোন মুখচ্ছবির প্রতীক্ষা করত চুপ-চাপ। বয়সও হয়েছে। সমাজের জোয়াল ধীরে ধীরে ভাইজীর ঘাড় চেপে ধরছে। ভয় আর পুলকে শ্যামাবাঈ কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

আর কিছুদিন পর থেকে গঞ্জনা শুরু হবে। ভাবীজীর মুখের অন্ন ঘুচে যাবে। ঘুমের মাঝে চমকে উঠবে ভাইজী। স্বর্গত বাবুজীর আত্মা

মহানির্বাণের ঘুম ভেঙে মেয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় ছট্‌-ফট করবে। সাদা-মাটা মেয়েগুলো যখন বেলোয়ারী কাঁচের বর্ণাঢ্যে নিজেদের আবিষ্কার করে, ঠিক সেই বয়েসেই ত' সংসারের বর্ণমালা থেকে তাদের নাম মুছে দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় মাজী, ভাইজী, ভাবীজী আর আত্মীয়-স্বজন, কুটুমসাক্ষেৎ!

অথচ এই জ্বালার তলায় একটা খুশির স্রোত বইতে থাকে অহরহ। জীবনের ওপরে গাম্ভীর্যের স্তর জমে, কিন্তু নীচের স্তরে একটা কম্পন শুরু হয়ে যায়।

শ্যামাবাঈরও আরম্ভ হয়ে গেছে। আজকাল আর ভাইজী হেসে কথা বলে না। চোখে চোখ পড়লে বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ভাবীজীও তাকে আড়াল দিয়ে ভাইজীর সঙ্গে কথা বলে। তবু ভাবীজী মে' মানুষ, উঠতি বয়সের মে' দেখলে মেয়ের দল তাকে ঠাট্টা না করে থাকতে পারে না। হোক সে দাদী, নানী, চাচী কিংবা ভাবীজী। দলে টানবার সময় তারা সম্পর্ক বিচার করে না। করে না বলেই রক্ষা, নয় ত' বাড়ীর মধ্যে এখন একঘরে হয়ে পড়ত শ্যামাবাঈ।

ভাবীজী তাকে কৌতুকের আধারে রঙিয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেছে। তার ছোট মেয়ে দীপা এসে ডাকলে:

-- ফুফুজী, মাজী ডাকছে।

—যা, এখন যাব না।

আঁচল ধরে একটু আকর্ষণ করলে দীপা:

—বাবুজী এসেছে, মাজী ডাকছে তোমায়।

—বাবুজী!

এ সময় বাবুজী, অর্থাৎ ভাইজী তুলারাম পাঁপড়ওয়ালার ফেরবার কথা নয়। রাত দশটার পর দোকানের কাজ মিটিয়ে বাড়ী আসে সে। তারপর ভোজন। ভোজনের পর ঘন ঘন উদ্গার তুলতে তুলতে ছাদে পায়চারী করে কিছুক্ষণ। দদ্রুবিলাসটাও সেরে নেয় সেই সময়। কোমর-কুঁচকীতে সযত্নে দাদ পুষেছে ভাইজী। ঐ দাদ চুলকানটুকুই তার একমাত্র বিরাম আর বিলাসিতা। তখনই দু'টো একটা মিষ্টি কথা বলে ভাবীজীর সঙ্গে। শ্যামাবাঈকেও কোন-কোন দিন ডেকে মশলা

দেওয়া হজমী জল চেয়ে নিয়ে পান করে। ওটা নিজের পরিচর্যা করান নয়, ভাইজীর আদর। যেমন আদর দেয় ছোট মেয়ে প্রিয়ম্বদাকে, যার ডাক নাম দীপা।

ধপাস করে কোন-কোন দিন নগ্ন ছাদের ওপর গড়িয়ে পড়ে ভাইজী আদর করে ডাকে :

—দীপা! বিটিয়া দীপা।

—জী, বাবুজী ?

দীপার জন্মের পর ভাবীজী নানা রোগে কিছুদিন শয্যাশায়ী ছিল, তাই ঝি-এর কোলে মানুষ হওয়ার ফলে মারোয়াড়ী-ভাষা বলতে পারে না সে। তার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলে ভাইজী।

দীপা আসতে ভাইজী বলে :

—মেরী দিনাঈ জরা নোচ দে বিটিয়া ?

দীপা সানন্দে ভাইজীর কোমরের দাদ চুলকে দেয়। দু-চারটে পয়সাও আদায় করে নেয় সুযোগ বুঝে। আগে এ কাজটা শ্যামাবাঈই করে এসেছে। তারপর করেছে করুণা। এখন এ অধিকারটুকু তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে দীপা। ভাইজীর আদরের বিটিয়া।

একান্ত অসময়ে বাড়ী এল ভাইজী, ডেকে পাঠাল তাকে। নানা রকম চিন্তার জাল বুনতে বুনতে শ্যামাবাঈ নীচে নেমে এল।

ইতিমধ্যে কামিজ খুলে ফেলেছে ভাইজী। গায়ের গেঞ্জিটা টেনে বুক-বরাবর গুটিয়ে নিয়ে, একটা চোখ ঈষৎ কুঞ্চিত আর অপরটা ব্যায়ত করে দাদ চুলকাতে-চুলকাতে তাকাল শ্যামাবাঈর দিকে। আরামের আতিশয্যে ভাইজীর সারা মুখখানা কুঁচকে আছে।

প্রশ্ন করলে শ্যামাবাঈ :

—ভাইজী ডেকেছ ?

সে কথার উত্তর দিলে না ভাইজী। ওদিকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে ভাবীজীকে উদ্দেশ্য করে বললে :

—গেলে কোথায়! চুলোর চেলাকাঠ হয়ে পুড়ে মরেছ নাকি—সাড়া দাও না কেন ?

ভাবীজীর ঝঙ্কৃত স্বর ভেসে এল :

—পুড়ে মরব কেন? অসময়ে এসে হাজির হলে—একটু নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে ত'?

চুপ করে গেল ভাইজী। ভোজনের আভাষ পেলে কথায় কথা বাড়ান তার স্বভাব নয়। অল্পক্ষণ পরেই ভাবীজী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। থালার ওপর খান দুই তিন ঘি মাখান রুটী, এককোণে একটুখানি পাঁপড় পোড়া। আর আচার।

ততক্ষণে পিঁড়ে পেতে ভাইজী বসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি শ্যামাবাঈ একঘটি জল এনে পাশে ধরে দিলে।

থালাখানা ভাইজীর সামনে নামিয়ে দিয়ে ভাবীজী চোখ তুলল :

—তোমার বিয়ে, কাল তোমায় বিকানীর থেকে দেখতে আসছে—বিকেলে। দয়া করে হাতে পায়ে মেহেদি পরে একটু ছিমছাম হয়ে তৈরী থেক। আমাদের করা সাজগোজ ত' পছন্দ হবে না। দিন-দিন যা তৈরী হচ্ছ!

ভাইজীর সামনে ভাবীজী শ্যামাবাঈর সঙ্গে রুক্ষ স্বরে কথা বলে। মেয়েমানুষকে বেশী 'নাই' দেওয়া ভাইজী পছন্দ করে না।

—বেশী বক্-বক্ কোর না।

জিব আর তালুতে আচারের স্বাদটা টক্-টক্ করে বাজিয়ে নিয়ে ভাইজী বললে :

—ছেলে ভাল। মিডিল পাস্। ঘিয়ের কারবার আছে। সালে তিন-চার লাখ টাকার লেনদেন। গদী আছে কলকাতায়।

কথাগুলো ভাইজী যাকে উদ্দেশ্য করেই বলুক, শ্যামাবাঈর কর্ণমূল আর গ্রীবাপ্রদেশ লজ্জার আঁচে জ্বলতে লাগল। অথচ পা দুটি যেন ভাইজীর পিঁড়ির সামনে আটকে আছে।

আরো এক আধটা কথা বললে ভাইজী :

—ছেলের বয়েস একটু—না, বেশী নয়, ছেলে বেশ সাবালক। আঠাইশ। শ্যামাবাঈ তেরো চৌদ্দো, না?

না, চৌদ্দোর চৌহদ্দি শ্যামাবাঈ বছর তিনেক আগে টপকে গেছে।

এখন সতেরো। বয়সে নেহাত বেমানান নয়। কিন্তু দেখতে কেমন? কথাটা মনে হলেও নিমেষে মন থেকে মুছে গেল।

শ্যামাবাঈর মন তখন রূপ-কারবার-বয়স—বিকানীর-কলকাতার গদী ছাড়িয়ে কোন্ একটা কল্পনার সাগরে ভাসতে আরম্ভ করেছে। সেখানে পার্থিব প্রশ্নের জটিলতা এড়িয়ে দু-টুকরো রঙীন স্বপ্ন পরিতৃপ্তি রসায়নে মিলিত হয়ে গেছে। নিজেকে আর আলাদা করে ভাবতে পারছে না শ্যামাবাঈ।

ভাইজী বললে :

—যাও।

যেতে-যেতে কানে এল, পাত্র আসছে না। তার পরিজনদের কেউ-কেউ আসছে। আর আসছে দু-একটি বন্ধু স্থানীয় আত্মীয়। ভালই হ'ল। অশ্বারূঢ় রাজপুত্রের সঙ্গে প্রথম দর্শন হোক—তার আগে মোটর কিংবা ফিটিন-চড়া ঘি-ওয়ালা পাত্রকে দেখতে চায় না শ্যামাবাঈ।

আহার পর্বের পর মেহেদি বাটা দিয়ে হাতে-পায়ে নক্শা এঁকে দিয়েছে ভাবীজী। এখনো শুখোয়নি। অতি সন্তর্পনে সেগুলো বাঁচিয়ে ভাবীজীর ঘরে খাটের এক কোণে চুপ করে বসে ছিল শ্যামাবাঈ। পাড়ার মেয়েরা এসেছে। নানী-দাদী স্থানীয়ারাও ভীড় করেছে চঞ্চল-চপলতায়।

হরকিশুনের চাচী সার্চলাইটের মত উজ্জ্বল দৃষ্টি শ্যামাবাঈর মুখের ওপর স্থির করে ফেলে বললে :

—যখন মুখ দেখতে চাইবে তখন চট্ করে মুখ দেখিও না। আরো নীচু করে নিও। আর যদি নাম জিগ্যেস করে—

বড়কী দাদী যেন আকাশ থেকে পড়ল :

—জয় গোপাল! আজকাল আবার নাম জিগ্যেস করে নাকি? কারা আসবে সব! মুরগী-টুরগী খায় নাকি?

ভাবীজী শাশুড়ীস্থানীয়াদের দিকে ঘোমটার আড়াল দিয়ে একটা মুখরোচক ঠাট্টা করে গেল। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল শ্যামাবাঈ।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শেষ বিকেলের দিকে জন তিন-চার লোক চনচনিয়াদের ফিটন্ চেপে দেখতে এল। মেয়ে দেখে চলে গেল তারা।

শুধু একজন, আগে থেকে জানা না থাকলে শ্যামাবাই মনে করত সেই পাত্র—সকলের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার হন্ত-দন্ত হয়ে ফিরে এল। শ্যামাবাই তখনো সেই ঘরে বসে আছে। ভাবছে।

তারই সামনে কথা হয়েছে সব। মেয়ে তাদের পছন্দ। দেনা পাওনা সাধ্য মত। মাঝে মাত্র আর মাসখানেক সময়। শুভস্য শীঘ্রম্। তাছাড়া যে ঘর সারাজীবন ধরে করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে সব মনের মত করে গুছিয়ে নেওয়াই ভাল। মেয়েও ডাগর হয়েছে। এখন একটি দিন যাওয়া মানে যৌবন কুসুমের একটি পাপড়ী খসে পড়া। তাছাড়া মাত্র কুড়িটি পাপড়ী নিয়ে মেয়েদের যৌবন কুসুম। এ মেয়ের তার মধ্যে ষোল-সতেরোটি ঝরে গেছে।

কার্পেটের ওপর কি যেন খুঁজতে লাগল লোকটা? কিছু ফেলেছে কি! খুঁজতে খুঁজতে অসাবধানে তার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। শ্যামাবাঈর দিকে একবার তাকিয়েই নিমেষে ঘরের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল ও'।

কাগজটা জরুরী হতে পারে। কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে এল শ্যামাবাঈ, কিন্তু অপরিচিত লোককে ডাকবার ভাষা তার জানা নেই। হাত পা নড়ল না। ইলেকট্রিকের তারে জড়ান ঘুড়ির মত হাতের মুঠোয় কাগজটা ঘুরতে লাগল। ফেলতে পারলে না।

বাঈ,

পাত্র আমার মামার ছেলে। টি. বি. আছে ওর। জীবনের সাড়ে পনেরো আনা ওর শেষ হয়ে গেছে; বাকী দু'পয়সা ফুরতে আর দেরী নেই।

নীচে নাম নেই। অন্যমনস্কতার ভানে ফেলে যাওয়া কাগজটা চিঠি। শ্যামাবাঈকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। মনে পড়ল শ্যামাবাঈর, মেয়ে দেখার সময় পকেট থেকে কাগজ পেন্সিল বের করে লোকটা টুক্-টুক্

করে কি লিখছিল যেন। পাশের লোকটিও পড়তে পারেনি, ওর হাতের তালুতে কাগজটা লুকান ছিল। শ্যামাবাঈ ভেবেছিল তারই সম্বন্ধে পাত্রের সমবয়সী বন্ধু-আত্মীয়টি নোট্ নিচ্ছে!

ভাবীজী স্বভাবতঃই শ্যামাবাঈকে একটু বেশী ভালবাসত। ইদানিং কিছুদিনের জন্য ভাইজীর শাসনে তাতে একটু তিক্ততা এসে গিয়েছিল। বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর থেকে সে তিক্ততাটুকু নিঃশেষে মুছে গেছে। ভালবাসার আধিক্যে ভরিয়ে দিয়েছে ভাবীজী! আর কটা দিন—এরপরই ত' এ সংসার থেকে মেয়েটার ছায়াটুকু মুছে যাবে। বাপ-মা-মরা মেয়ে সুদূর বিকানীরে চলে যাবে। সেখান থেকে কে আর তাকে আনবে। কে খোঁজ নেবে।

তাই ছুটি পেয়েছে শ্যামাবাঈ। শেষের দিনকটা আপ্যায়নের আল্গা ফাঁসে তাকে জড়িয়ে রাখতে চায় ভাবীজী।

সন্ধ্যা-সন্ধ্যা খাইয়ে দিয়ে ভাবীজী বলে:

—যা এবার শুয়ে পড়। খুব ভোর-ভোর উঠবি। কাল সোলেমানের লুগাঈ শাড়ি-ওড়নার নমুনা নিয়ে আসবে। নিজে দেখে কল্কা পছন্দ করে দিবি।

রঙীন শাড়ি-ওড়নাতে চমৎকার জরির কাজ করে সোলেমানের বউ। মারোয়াড়ী মুসলমান। ঘরে ঢুকতে পায় না। দরজার পাশে বসে নমুনা সংগ্রহ করে; কথায়-কথায় হেসে চৌকাঠের ওপর গড়িয়ে পড়ে মেয়েটা। কত আর বয়স মেয়েটার—পঁচিশ-ত্রিশ বড় জোর। মনে হয় মানুষ নয়, পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরান একটা হাসির ফোয়ারা। হাসে শুধু হাসে, আর সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়ের ওপর ঝল্মলে জরির ফুল তোলে। সেগুলিও যেন তার হাসির টুকরো।

হেসে গড়িয়ে পড়ে সোলেমানের লুগাঈ:

—তোমার মিঞা আসবে বাঈ!

শ্যামাবাঈ সেখান থেকে উঠে যেতে চায়।

—বস বাঈ?

আবার হাসে সোলেমানের লুগাঈ।

—এতে হাসির কি হল ?

রাগ করে শ্যামাবাঈ বলে।

—হাসির কি হল !

বিস্ময়চিহ্নের মত সোলেমানের লুগাঈ সোজা হয়ে বসে।

—তোমার মিঞা আসবে। ফুল ফুটবে, আর আমি হাসব না ! ফোটাফুল দেখে ত' বাচ্চারাও হাসে, মায়ের পেটের ভেতর থাকলেও হাসে, আর আমি হাসব না ? কি বল তুমি বাঈ !

হাসি। আবার হাসি। হাসতে-হাসতে সোলেমানের লুগাঈর চোখের ভেতরটা শিশির-ভেজা পদ্মকুঁড়ির মত চক্‌চকে হয়ে ওঠে।

সোলেমানের লুগাঈ হাসে, জানেনা সে চিঠিটার কথা। কেউ জানে না। ভেতরের ঝড়টাকে চাপা দেবার জন্যে কি পরিমাণ প্রশান্তির অভিনয় করতে হচ্ছে শ্যামাবাঈকে, তা যদি সোলেমানের লুগাঈ জানত! ছোট্ট চিঠিটার প্রত্যেক অক্ষরটা আসন্ন বৈধব্যের সজ্জার মত তার রক্তে অঙ্গে জড়িয়ে গেছে। তার ওপর শরমের কপট ওড়না জড়িয়ে প্রহর গুণে চলেছে শ্যামাবাঈ।

ভাবীজীর দৃষ্টিতে কি ধরা পড়ে যায় কিছু ! মাঝে-মাঝে একাগ্র হয়ে কি খোঁজে ও শ্যামাবাঈর মুখে। সান্ত্বনা দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে কেন ?

—গোপালজী মেয়েদের বরফের মত করে গড়েছে, বাঈ—

ভাবীজী সাম্‌নে এসে বসে :

—পাহাড়ের ওপর জমে, তারপর বয়সের তাপ লেগে সেখান থেকে গলে নদীতে বয়ে যায়।

নিজের মেয়ে ক'টির দিকে তাকিয়ে ভাবীজী বলে :

—মেয়ে আর মেয়ে থাকে না, মা, দাদী, নানীর মধ্যে গলে যায়। আমার ত' নিজের কথা মনেও পড়ে না, বাঈ। হোসেনাবাদের কথা যখন মনে করতে যাই, তখন হয়ত' দেখি তোর ভাইজী রুটি চাইছে, কি দীপা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে—

কথার মাঝখানেই হঠাৎ এক-একটা প্রশ্ন করে ফেলে শ্যামাবাঈ : —সব বরফই কি গলে যায় ভাবীজী ? সকলেই কি মা-দাদী-নানী হয় ?

ভাবীজী শ্যামাবাঈর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবীজী কতদূর পড়েছে শ্যামাবাঈ জানেনা। কিন্তু শুনেছে ভাবীজীদের বংশ শিক্ষিতের বংশ। সেখানে রোকড়-নকল-বহি খাতার বাইরেও একটা জগতের অস্তিত্ব আছে। তাই ভাইজী স্ত্রীকে বাপের বাড়ী যেতে দেয় না। ভাবীজী তাকিয়ে থাকে, তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ক্ষণিকের জন্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়।

উত্তর দেয় তারপর :

—না, সকলেই হয়ত মা-দাদী-নানী হয় না ; তার আগেই কেউ কেউ ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ওটা নিয়ম নয়, তেলে-ভরা 'দিয়া'-ও ঝড়ে-ঝাপটায় নিভে যায়—তেল ফুরোবার আগেই নিভে যায়, তাই বলে কি কেউ আলো জ্বালে না ?

—কিন্তু ভাবীজী, কেউ যদি জানে আঁধি উঠবে, দিয়া নিবে যাবে, তাহলেও কি কেউ দিয়া জ্বালে ?

ত্রস্তে ভাবীজী বলে ওঠে :

—ও কথা কেন বলছিস বাঈ !

—না, এমনিই !

শ্যামাবাঈ হাসতে থাকে, বনমর্মরের হাসি কান্না বলে ভুল হয় যেন!

এত কথার পরও চিঠিখানা ভাবীজীকে দেখাতে পারেনি শ্যামাবাঈ। ডাকে খোলা চিঠি এলে হয়ত পারত। ভাবীজী, ভাইজী এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীকে ডেকে দেখিয়ে দিত। একটা মুমূর্ষু মানুষের পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গে যাওয়ার আয়োজন কত সুষ্ঠু হতে পারে, জনে-জনে দেখিয়ে দিত। কৌমার্যকে স্বর্গেও ভয় করে, স্বর্গললনাদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন আসে বোধহয়। তাই বিকানীরের ঘি'ওয়ালার পিতা পুত্রের পার্থিব বাসনা একটা তরুণীর দেহ-মনে, আচারে স্মৃতিতে বেঁধে রাখতে চায়। হাঁ, প্রচার করে দিত সে, কিন্তু পারেনি। চিঠিটা দেখাতে পারত কিন্তু পরিস্থিতিটাকে বোঝাত কি করে! ভাবতে গেলে নিজেকে অভিসারিকা মনে হয়।

চিঠি এসেছে বিকানীর থেকে। পর-পর তিন দিন। তিনখানা চিঠি।

বিয়ে দিতে হবে বিকানীর থেকে। কারণ অনেক। কারণগুলি খণ্ডনীয় কি না বিচার করে দেখলে ভাইজী।

ভাবীজীও দেখলে, দেখে মন্তব্য করলে :

—ছেলে যখন এখানে আসতে রাজি নয়, তখন সম্বন্ধ ভেঙে দাও।

হাসলে ভাইজী। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার কোমর চুলকে উঠল। —একটা চোখ মুদ্রিত করে সেই কাজে লেগে গেল সে।

ভাবীজী বললে :

—ঐ কথাই তা হলে তার করে দাও ?

—হুঁ !

ভাইজীর বিশিষ্ট কাজে বাধা পড়ল।

—এমন সম্বন্ধ ভেঙে দেব !

ভাইজীর মুখের তুবড়িতে যেন হাসির ফুলঝুরির স্পর্শ হ'ল। হাসির ফুল কাটতে কাটতে বললে :

—আবার সেই পুরাণের যুগ ফিরে আসছে। আজকাল ছোঁড়াগুলো সব লালচা হয়ে যাচ্ছে ভাই, নয়তো উমা মহারাণীকেই ত' শিউ মহারাজের দরবারে মালা হাতে হাজির হতে হয়েছিল। আরও হিস্টারী আছে।

আর কি হিসটারী আছে তা জানবার জন্য ভাবীজী মোটেই ব্যগ্রতা জানালে না।

শুধু বললে :

—আমার মন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করছে !

—আরে ছ্যাৎ, পাঁচ সাতশো টাকা টিরেন ভাড়া ত'—তা যায় যাবে। আমি তুলারাম পাঁপড় ওয়ালা, ওয়াজিব খরচ করতে ভয় পাই না।

ভাবীজী ভ্রু কুঁচকে খিঁচিয়ে উঠল :

—চিন্তার মানেই তুমি টাকা মনে কর বুঝি ?

ভাবীজীকে আর আস্কারা দিল না ভাইজী :

—টাকা নয় ! তবে ছাড় ওসব কথা, ফালতু বাৎ—

যাত্রার আয়োজনের দুটো একটা দিন ধরে পূর্ণ উৎসব চলল। লাট্টুর মত বাড়ীময় নেচে বেড়াল ভাইজী। আয়োজনের ঢেউ যেন শ্যামাবাঈকেও

মাঝে-মাঝে ভাসিয়ে নিত। ভুলে যেত সব। শুকনো পাহাড়ী শ্যামলতার মত উৎসবের দলে সে উজ্জীবিত হয়ে উঠত।

বিকানীরে যে দলটা পৌছিল তার কলেবর নেহাৎ ছোট নয়। সারা পথ হৈ-হৈ করেছে ভাইজী। ক'দিন ছুটি পেয়ে শাস্ত্রালোচনা করেছে ভাবীজীর সঙ্গে। পুরোহিত লাদুরাম শর্মাকে তর্কের তীরে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তার মধ্যেই কিন্তু মাঝে মাঝে পকেট থেকে নোট বই বের করে খরচের হিসেব লিখেছে। খরচে কার্পণ্য নেই, কিন্তু পাই-পয়সার হিসেবের গরমিলে এক-একটা দিন উপোষ করে, শুধু জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

শ্যামাবাঈকে আদর করে প্রায়ই বলে :

—উমা মহারাণী চলেছে শিউ মহারাজের কাছে। জয় বাবা বজর, —বলি জয় বাবা বিশ্বনাথ—হর্ হর্ মহাদেব—। জয় জয় মাতা গিরি পারোবতী।

বিকানীর পৌছানোর সঙ্গে-সঙ্গেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। উমা মহারাণী আর শিউ-মহারাজ সকাশে পৌছাতে পারলে না। গত রাতেই তিনি বৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রস্থান করেছেন। হঠাৎ। হার্টফেল!

কথায় কথায় ঘি-ওয়ালার পিতা বলে ফেললে :

—লোক কখনও চিরকাল বাঁচবার জন্যে আসে না। কিন্তু এ মেয়েটা এত অপয়া যে সিঁদুর দেওয়ার ফুরসৎটুকুও ছেলেটাকে দিলে না? হা—গোপাল!

দুঃখের বোঝা হা-হুতাশায় অনেকখানি লাঘব করে নিলে ভদ্রলোক। তারপর নতুন রূপ ধারণ করলে। অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিলে ভাইজীকে। মুখে বলা যায় না, কানে শুনলে কান আপনিই বধির হয়ে যায়, এমন সব বিশেষণ জড়িয়ে দিলে শ্যামাবাঈর নাম আর পরিচয়ের সঙ্গে।

বিকানীরের মাটীতে শিকড় নেই ভাইজীর। নিজের কোটের বাইরে দাঁড়িয়ে কোন প্রতিবাদ করতে পারলে না। শুধু অপমানের টুকরাগুলো নিজের ওপর থেকে ছিটকে দিলে শ্যামাবাঈর ওপর।

অদূরে প্লাটফরমের একপাশে রাখা তোরঙ্গের ওপর বসে শ্যামাবাঈ কাঁপছে। পায়ের তলার মেঝে ছোট ছোট ভূমিকম্পের তরঙ্গে দুলছে। স্থির হয়ে বসা সম্ভব নয়। পাশে দাঁড়িয়ে ভাবীজী, তার মুখ ভরা আষাঢ়ের মেঘ। বর্ষণের ইঙ্গিত আছে চোখ দুটিতে। হাত বাড়িয়ে ভাবীজীর হাত স্পর্শ করলে শ্যামাবাঈ। বৈদ্যুতিক স্পর্শে চমকে উঠল সে। হাত ছাড়িয়ে খুব মৃদু স্বরে স্বগতোক্তি করলে একটা। ঠোঁট দুটির কম্পনে বক্তব্যের ভার বোঝা গেল। কথাটা ঠিক শোনা গেল না।

এবার ভাইজী এখানে এসে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গে যেন ভীমরুল দংশন করেছে। নিরাশা আর অপমানে বিকৃত মুখটা বিকৃততর করে গা চুলকাচ্ছে ভাইজী।

বাবার কষ্ট দেখতে পারে না দীপা। এতক্ষণ শঙ্কিত হয়ে সে মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। এবার এগিয়ে গেল ভাইজীর কাছে।

—ম্যায় নোচ দুঁ বাবুজী ?

—হুঁ !

সেই মুহূর্তে যেন ভাইজীর ইচ্ছে হল হাতুড়ি দিয়ে দীপার কচি মাথাটা চূর্ণ করে দেয়। সজোরে তার মাথায় একটা কিল দিয়ে বললে :

—যা, যা, সরে যা ! দূর হয়ে যা—

কাঁদতে গিয়েও দীপা চুপ করে গেল। পরিস্থিতিটাকে বুঝতে পেরেছে সে। কান্নায় ফল হবে না। তার পাশের সকলেই এখন পাথর। উত্তপ্ত পাথর। চোখের জল নিমেষে তপ্ত-কঠিনতায় শুষে নেবে। হয় ত' বাবুজী নড়া ধরে ঐ রোষান্বিত ইঞ্জিনটার তলায় ফেলে দিতে পারে। সব পারে এখন বাবুজী।

কোন রকমে হাত বাড়িয়ে শ্যামাবাঈ দীপাকে নিজের কাছে টেনে নেয়। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে না। ভাইজীর চোখের আড়ালে শুধু তাকে টেনে নিতে চায়।

ভাইজী বললে :

—থাক্ থাক্—ওকে ছোঁবে না। তুমি অপয়া !

তবু দীপাকে ছাড়লে না শ্যামাবাঈ। সামনের লাইনের নীচে বিছান পাথরকুঁচির মত ভাইজীর রূঢ় কথাগুলো তার মনের তলায় গিয়ে শান্ত

ভাবে শুয়ে পড়ল। ওপরে রোষান্বিত এঞ্জিনটার মত কঠোর মনটা দাঁড়িয়ে রইল তার। আর একটু আঘাত করলেই সে প্রত্যাঘাত করবে। তা সে যেই হোক—ভাইজী কিংবা তার আদরের দেবতা শিউ মহারাজ।

এক পাক নেচে নিয়ে ভাইজী আবার আরম্ভ করল :

—ছি ছি ছি! চিরদিনের মত খানদানটা ডুবিয়ে দিলি? আর কেউ এ বংশের মে' নেবে? পাপী শয়তানী—

শেষের শব্দদুটো উচ্চারণ করবার সময় ভাইজী তাকালে শ্যামাবাঈর মুখের দিকে। কি অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি তখন! মানুষের চোখে অমন বিদ্বেষ, জ্বালা আর শ্লেষ কোথা থেকে ফুটে ওঠে? কোথায় লুকিয়ে থাকে ওঠা!

আরো অনেক কিছু বলে গেল ভাইজী। সব কথাগুলোই কানে গেল কিন্তু মর্মে পৌঁছাল না সব গুলো। ভাইজীকে মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না সে সময়টা। তার ব্যর্থ আক্রোশের চীৎকার শুনে একটা ছবি যেন বারবার শ্যামাবাঈর চোখের সামনে ভেসে আসছিল। সিনেমা ছবির দানব। নিরাপদ আসনে বসে তার অভিনয় দেখছে শ্যামাবাঈ।

এ' ছাড়া উপায় ছিল না। নিজের মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনার সূত্র খুঁজে নিতে হলে একটা বিচিত্র কিছু ভাবা চাই ত'! কাছের অন্যান্য লোকগুলি, এমন কি ভাবীজী পর্যন্ত, এই দৃশ্যের নীরব দর্শক। শ্যামাবাঈর দুর্দশায় তাদের অন্তর কাঁদলেও ভাইজীকে বাধা দেবে না কেউ। নাটকের সম্পূর্ণতা ব্যাহত করবে না।

আবার একটা মন্তব্য করলে ভাইজী। একান্ত অশ্লীল।

ভাবীজী পর্যন্ত কথাটা শুনে বেশ কিছুদূর সরে গিয়ে বললে :

—ও কি বলছ! তুমি না ভদ্দরলোক?

—ভদ্দরলোক বলেই ত' বলছি।

সীমাহীন ঘৃণা ফুটে উঠল ভাবীজীর সুরে ঃ

—ওকে ও কথা বললে তুমি নিজে কি বাদ পড়? তুমিও সেই মা-বাপের সন্তান।

—না, আমি মা বাপের সন্তান নয়। যে মা-বাপ এ' রকম মেয়ের জন্ম দেয় আমি সে মা-বাপের সন্তান হতে পারি না।

—তবে কে তুমি ?

—আমি আমি—ম্যায় স্বয়ম্ভুব !

কথাটা শুনে শ্যামাবাঈর অপমানের বারুদে পোড়া মুখখানিতে হাসির ফুলঝুরি ফুটল। ভাবীজীও হেসে ফেললে।

—তা তোমার কথাবার্তাগুলো সেই রকমই বোধ হচ্ছে !

আলবাৎ।

ভাইজী নাচতে লাগল। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা ! অপদস্থ হয়ে অসংলগ্নতার মাটিতে যাঁতার মত ঘুরছে।

সব কথা শ্যামাবাঈর আজ আর মনে পড়ে না। মনে থাকলে একটা সান্ত্বনা থাকত। আজ সেই দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়ে মহাদেও খেতনকে আনন্দ দিয়ে যেত সে। নিজেও মাঝে মাঝে রয়ে বসে স্মৃতি আস্বাদন করত।

বেশ গরম পড়েছিল সে রাতটা। ঘরের ছোট জানালা দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসে তা'তে সময় সময় নিঃশ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য মনে হয়। তবু ঘরেই শোয় শ্যামাবাঈ। ভাইজী সপরিবারে চাঁদের চাঁদোয়া টাঙিয়ে ছাদে ঘুমোয়। ভাবীজী ডাকে এক-একদিন। কিন্তু শ্যামাবাঈ ওপরে যেতে পারে না। অস্বস্তি বোধ হয় তার।

সেদিন ভাইজী ছিল না। পাঁপড়ের চালানে কি একটা বিঘ্ন উৎপত্তি হওয়ায় তাকে সাহেবগঞ্জ যেতে হয়েছিল। পরদিন সকালের ডাক-গাড়ীতে ফেরবার কথা।

প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি ঘুমটা ভেঙে গেল। পচা গরমে রোমকূপ-গুলো বুজে গেছে। দম আটকে আসে। ভাইজী নেই। একটা ছোট চাটাই আর বালিস টেনে নিয়ে শ্যামাবাঈ সিঁড়িতে উঠল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পা পৌছাল না। আড়ি পেতে শুনতে লাগল কথাগুলো। বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে স্বয়ম্ভুব ভাইজীর ভৈরব নাদ। ভাবীজীর কথা ভাসা-ভাসা।

কাজ চুকে গেছে। রাতের প্যাসেঞ্জার ট্রেনেই ভাইজী ফিরে এসেছে। সুসংবাদ এনেছে একটা।

বড় মেয়ে করুণা বিবাহযোগ্যা হয়ে তেরো-চৌদ্দো বছর বয়সের মাঝে দোল খাচ্ছে। তার জন্যে পাত্র দেখে এসেছে ভাইজী। বেশ ছেলে। গদীতে তাকিয়া আঁকড়ে বসতে শিখেছে। লেখাপড়া জানে। আর দু-চার বছর পড়লেই 'এনট্রান্স' পাশ করতে পারত। কিন্তু বাপের শরীরের অবস্থা ভাল নয়। আজ আছে কাল নেই। তাই বাধ্য হয়ে কারবার, বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নিতে হচ্ছে তাকে। একমাত্র ছেলে। ইতিমধ্যে কাজ শিখেওছে বেশ।

—চেক, হুণ্ডি, বুলুম স্ট্যাম্প—ঠিক ঠিক উত্তর দিলে গো!

—আংরেজি জানে?

ভাবীজী প্রশ্ন করলে।

জরুর! তার-টার সব পড়তে পারে। আর আংরেজি জেনে কি করবে? ঐ যা জানে তাতেই আংরেজি জাননে-ওয়ালাকে দিয়ে জুতো সাফ্ করাতে পারবে। ঐ কলমের আংরেজির খোঁচায় বাঙালীবাবুর নোক্‌রী ডিস্‌মিস্ করতে পারে। ইওর সার্ভিস ইজ নো লংগার রিকোয়ার্ড —আংরেজি মানে ত' এই! তা জানে বই কি।

ভাইজীও ঐ একটি আংরেজি জানে, আর বাঙালীবাবুর ওপর তার কিছুমাত্র আস্থা নেই। হিস্‌টারী বলে, তারা সোনার হিন্দুস্থানকে পানির দরে আংরেজের হাতে বেচে দিয়েছিল। তারা না জানে দেশকে ভালবাসতে, না জানে উচিত দামে সওদা বেচতে। আর দাম পেলে তারা জরু বেটিকেও—

ভাবীজী কথার মাঝেই আপত্তির ছেদ টেনে দেয়।

—খামোকা বাঙালীকে দোষ দিচ্ছ কেন? মেয়ের জন্যে পাত্র দেখে এলে, সেই কথাই বল।

হিস্‌টারীতে বাধা পড়ায় ভাইজী যেন কিছুক্ষণের জন্য মুষড়ে পড়ল। বেশ কয়েক মুহূর্ত তার কথা শোনা গেল না।

ভাবীজীর ঔৎসুক্যের আঁচ কোন কালেই বিশেষ গন্‌-গনে নয়। যা হবার ছিল হ'ল, যা হবার নয় হ'ল না—এই ধরণের একটা নির্লিপ্ততার ভাবে সে প্রায় সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন। তবু কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ, তাই কিছু বলতেই হয়: অন্যথায় ভাইজী হয়ত অনেক কিছু অর্থ করে নেবে।

—তা কথাবার্তা কতদূর হল ?

—লেনদেন তিলক-চাড়ি সব ঠিক হয়ে গেছে এখন মে' দেখে গেলেই—

উৎসাহিত হয়ে উঠল ভাইজীর কণ্ঠস্বর। হঠাৎ বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ল শ্যামাবাঈর। আবার মেয়ে দেখা। আবার!

বছর তিনেক আগেকার সেই আবরণটা চোখের সামনে থেকে সেই মুহূর্তে সরে গেল। চিঠিটার কথা মনে পড়ল। এখনো আছে—তোরঙ্গের নীচে, খবরের কাগজের তলায়, উত্তর দিকের কোণে। নিজের নির্দোষিতার সাক্ষ্য। পয়ের প্রমাণ। ভাইজী কথায়-কথায় যে সতীত্বে হিসটারী প্রসঙ্গ তোলে—সেই সতীত্বের সন্দর্ভ।

মেয়ে দেখতে আসবে শীগগিরই। সাহেবগঞ্জ থেকে ভাগলপুর। এবেলা এসে ও বেলা ফিরে যাওয়া যায়। যে কোনদিন আসবে ঝুনঝুন-ওয়ালারা। শুধু একটা শুভ দিনের অপেক্ষা। আসবার আগে তাদের খবর দিতে বলে এসেছে ভাইজী। কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু বলতে হয়েছে শ্যামাবাঈর জন্যে। সেদিন এই শয়তানী অপয়া মেয়েটাকে কোন ছুঁতয় বাড়ী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কনে দেখানর শুভলগ্নে তার ছায়াটাও যেন এ বাড়ীতে না থাকে।

—ছিঃ

খুব মৃদু কণ্ঠে ভাবীজী বললে।

বিস্ময়-রোষ যুক্ত স্বরে ভাইজী বলে উঠল :

—ছিঃ! কি বলছ তুমি ? অপয়া লোকের হাওয়ায় সোনার লছমী গলে গোবর হয়ে যায়। আমার বিটিয়ার সাদী যখন হবে তখন শামুকে এ বাড়ীতে থাকতে দেব না।

—লোকে কি বলবে!

—বলবে কি ? তারিফ্ করবে। সাচ্চা মরদ আমি।

ভাইজীর বুকটা বোধ হয় দম্ভের আধিপত্যে স্ফীত হয়ে ওঠে :

—সাচ্চা মরদ—মা'র পেটের বহনকেও ক্ষমা করি না। নিজের বেটার সগুন যদি খারাপ হয়, তাকেও টুকরো-টুকরো করে গঙ্গাজীতে ভাসিয়ে দেব।

পুত্র সন্তান নেই—তাই আশঙ্কিত হবার মত ভাবীজীর আপাততঃ

কিছু নেই, নয়ত' শিউরে উঠত সে। নৈতিকতা, পয় ইত্যাদির সম্বন্ধে ভাইজীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, নিজের মনগড়া শাস্ত্র আছে, নিয়ম আছে, তার সামান্তের খণ্ডনে আয়ত্বের মধ্যেকার আত্মীয়-কুটুম কেউ ক্ষমা পায় না। কিন্তু সংসারের বাইরে ভাইজী অন্য মানুষ। মাটির মানুষ। নরম মাটির। সেখানে লক্ষ মানুষের পায়ের ছাপ বুক পেতে নিতে ভাইজী তিলমাত্র কুণ্ঠিত নয়। তারা লছমী!

সিঁড়ির এক কোণে শ্যামাবাঈ নিশ্চল হয়ে বসে পড়েছিল। ওপরে ওঠা ত' সম্ভব নয়ই, নীচে চলে যাওয়ার কথাও মনে পড়েনি। পড়লেও সাধ্যে কুলয়নি। চাপা নিঃশ্বাসে বদ্ধ সিঁড়ির আবহাওয়া জলে ভেজা বাদুড়ের ডানার মত তার মাথার ওপর ক্রমশঃ ঝুলে পড়ছে। চেপে বসে যাচ্ছে।

এরপর ভাইজীর স্বর আবেশের বিলম্বিত লয়ে স্তিমিত হয়ে পড়ল। দু'একটা কথার পর একটা কাতর অনুরোধ জানালে।

আপত্তি করলে ভাবীজী:

—না। বড্ড ঘুম পাচ্ছে এখন। দু'ঘণ্টা পরেই সকাল হয়ে যাবে।

ভাইজীর কণ্ঠের অনুনয়ের চাপ পড়ল আবার:

—একটুখানি, লছমী রাণী—দু'চার মিনিট।

—তার বেশী নয় কিন্তু?

প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে চায় ভাবীজী।

অল্পক্ষণ পরেই ভাইজীর আরামের আভাষ ভেসে এল। ঘুম-শীতল রাতে বেশ স্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে!

ভাইজীর কোমরের দাদ চুলকে দিচ্ছে ভাবীজী। সুখ-মুদিত-চক্ষু ভাইজী দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দৃষ্টির আড়াল থেকেই শ্যামাবাঈ বুঝতে পারছে; ভেতরকার বিদ্বেষ আর বিরক্তির চাপে ভাবীজীর চোখ থেকে জল ঠেলে আসছে।

কমলের মা নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেই কমল। কমল শর্মা। কলেজের পড়া শেষ করে কি একটা হিসাব পরীক্ষার পাশ দিয়ে এসে এখানেই সে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। গত বছর বিয়েও হয়েছে। বেশ ফুটফুটে

বউটা। ছাদের ওপর থেকে দেখা যায় ওকে। মাঝে-মাঝে ওদের দাম্পত্যলাভের টুকিটাকিও এ বাড়ীর ছাদ থেকে নজরে পড়ে। শ্যামাবাঈ চোখ ঘুরিয়ে নেয় তখন। কদিন থেকে দেখা যাচ্ছে না বউটাকে। শুনেছে সন্তান সম্ভবা। বাপের বাড়ী গেছে বোধহয়।

সকাল বেলা কমলের মা নিজেই ডাকতে এল :

—তৈরী হসনি ! আর কি বা তৈরী হবি ? চল্ আমার ওখানে, বউটা নেই ; সারাদিন একলাটি ভাল লাগে না।

—এত সকালে !

আরও কিছু বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল শ্যামাবাঈ, ঘরের ভেতর থেকে ভোজনরত ভাইজী বলে উঠল :

—এত সকালে আবার কি ? ডাকতে এসেছেন, যাও।

কথাটা শ্যামাবাঈর কানে মোটেই ভাল লাগল না। মেয়েলী বিচার আর কুটিলতা জড়ান ভাইজীর তেজটা কেমন অস্পৃশ্য মনে হয়। গায়ে আঁচ লাগলেই গা ঘিন্-ঘিন্ করে ওঠে।

করুণাকে দেখতে আসবে আজ। আসুক। বিয়ে হয়ে যাক মেয়েটার। সুপাত্রে পড়ুক। সুখী হোক মেয়েটা। শ্যামাবাঈর ছায়া যদি তার ওপর অলক্ষ্মীর অভিসম্পাত আনে তাহলে সরে যাচ্ছে সে। কিন্তু ভাইজীর নীচতা আর সহ্য হয় না। বাড়ীর পেছনের উঠোনটায় দু-একটা গাছ আছে। কলকে ফুলের গাছও আছে একটা। শুকনো বিচি মাটিতে ছড়িয়ে থাকে।

—চল এখুনি যাচ্ছি।

প্রসাধনের সামান্যতম স্পর্শ না নিয়েও শ্যামাবাঈ কমলের মা'র আগেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত দিনটা কাটল ঐ বাড়ীতে। সূর্যাস্তের পর কমলের মা বললে :

—সন্ধ্যে হয়ে গেল, চ' বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

শ্যামাবাঈ হাসল। তীরের চেয়ে সুতীক্ষ্ণ হাসি তার ঠোঁটের দু'পাশে ঝুলে রইল। বিষমাখা তীর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিক্ষেপ করলে একটা :
—ভাবীজী এখানে নেই বলেই ত' আমায় আজ আনলে চাচীজী, এখন

বাড়ী যেতে বলছ কেন? ভাবীজীর রাত্তিরে না থাকাটা বুঝি তোমাদের অবোশ আছে?

কথার অশ্লীল শ্লেষটা চাচীজী অতটা বুঝতে পারলে না, কিন্তু বলবার পরই শ্যামাবাঈর জিভটা আড়ষ্ট হয়ে ঝুলে পড়ল। নোংরা কিছু যেন একটা জিভের ওপর লেপে গেছে।

পাশের ঘর থেকে কমলও বোধহয় কথাটা শুনেছে। এইমাত্র সে বাড়ী ফিরেছে। ছেলেবেলার অবাধ দিনগুলির পর আজ এই প্রথম তার এত কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে শ্যামাবাঈ। কি ভাবল ও! লজ্জায় শ্যামাবাঈর সর্বাঙ্গ খান্-খান্ হলে গেল। কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অতিকষ্টে শ্যামাবাঈ বললে:

—এইটুকু ত' রাস্তা, আমি একলাই চলে যেতে পারব।

কোন রকমে হোঁচট খেতে খেতে বাড়ী ফিরল শ্যামাবাঈ।

হঠাৎ পেছন দিকে শাড়ির খস্-খস্ শব্দ শুনে চাচীজী চমকে উঠল:

—কে রে! ওঃ, তুই?

—হাঁ চলে এলুম।

চাচীজী আচারের মশলা কুটছিল। তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়ে পাশে বসল শ্যামাবাঈ। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে:

—তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে চাচীজী।

—তা, এলেই ত' পারিস? বলতে গেলে সামনা-সামনি বাড়ী—গাঁ হলে এ বাড়ী ওবাড়ীর মেয়ে বোঝা যেত না।

সামনের কামরাঙাগুলোর দিকে তাকিয়ে শ্যামবাঈ বললে:

—কামরাঙার আচার করছ? এতে মেহনতই আছে, খেতে তেমন ভাল হয় না।

—কুটুম্ব সাক্ষেতের থালা সাজিয়ে না দিলে বলবে কি তাই হাতের গোড়ায় যা পাই—। তা এখন আর পেরে উঠি না, বিন্নী যা পারে করে।

বিন্নী! পুত্রবধূ। কমলের ফুটফুটে বউটা। নাম শুনে ঈর্ষার কাঁটা বিঁধল শ্যামাবাঈর জ্র দুটিতে। কুঁচকে উঠল একটু। চাচীজীর দৃষ্টিতে এসব পড়ে না, তাই রক্ষা। নয় ত'—

—কবে আসবে তোমার বিন্নী, চাচীজী ?

—কবে! এখন ত' সবে সাত মাস। তারপর কোলে ছেলে নিয়ে ফিরতে আরও ছ'মাস ন'মাস ত' গড়িয়ে যাবেই। তুই আসবি মাঝে-মাঝে। সারাদিন একলাটি ভাল লাগে না। মেয়ে হওয়া বড় পাপ। চার-চারটে মেয়ে, সব বিয়ে হয়ে চলে গেল—বাড়ী খাঁ-খাঁ করে।

কমলের প্রসঙ্গ শ্যামাবাঈ একটু তুলতে চায় :

—কেন ? আরও লোক ত' আছে ?

—লোক! বেটাছেলে আবার লোক নাকি ?

খেদের ভারে চাচীজীর স্বর খাদে নেমে গেল :

—ছেলে সারাদিনই বাইরে; সন্ধ্যেয় বাড়ী ফেরে, আবার তখুনি বেরিয়ে যায়—আর তার বাপ দেশ-দেশান্তরে চেলা-চামণ্ডো-জজমান সামলাচ্ছে। ঘর ভর্তি বেটাছেলে নিয়ে বাস করা আর বনে বাস করা দুই-ই সমান।

—বেটাছেলে কি জন্তু ?

—না, না, তা কেন, তা কেন ?

বিঘতখানেক জিভ কাটে চাচীজী।

—তবে ?

কৌতূহলের শিখরে শিখরে শ্যামাবাঈ নাচতে থাকে।

উত্তর খুঁজে না পেয়ে চাচীজী বিরক্ত হয়ে বলে :

—জানিনা, বাবা, বকিয়ে মারলে।

—বিন্নী তোমায় বিরক্ত করত না ?

—কে বললে করত না!

চাচীজীর স্বর কেঁপে যায় :

তাই ত' লোকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাই। যে রোজ কথায়-কথায় ডুবিয়ে রাখে সে যদি হঠাৎ চলে যায়, তখন কেমন লাগে বল্ ত' ? আমি পাঠাতে চাইনি, কিন্তু কমল কিছুতেই শুনলে না; বললে, তুমি একলা মানুষ মা'জী পারবে না। কতই ত' মাকে দেখছে!

প্রগলভা হবার চেষ্টা করে শ্যামাবাঈ :

—ছেলে না দেখুক, নাতি ত' হবে সে দেখবে।

—হাঁ, পেটের ছেলে সব করলে, দুধ গেলাবে নাতি।

শ্যামাবাঈ হাসে। না হেসে পারে না। বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা যায়।

—কমল!

চাচীজী উঠল, দরজা খুলতে হবে। শ্যামাবাঈ ঢোকবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিল।

—তোমায় আবার হাত ধুতে হবে চাচীজী, আমি উঠছি।

শ্যামাবাঈ উঠে গেল, দরজা খুলে দিতে।

সাড়া পাওয়া গেল না কমলের কাছ থেকে। তবু নিরাশ হল না শ্যামাবাঈ। অন্ধকারের পাখীরা ঘন রাতের বুক চিরে আলো খুঁটে খায় —সেই রকম একটা উদগ্র প্রত্যাশায় শ্যামাবাঈ সজাগ হয়ে রইল। ভাইজীর দেওয়া মিথ্যে বিশেষণগুলো কমলকে দিয়ে সত্য করিয়ে নিতে হবে। মিথ্যে আর সহ্য হয় না। মিথ্যে গঞ্জনা, মিথ্যে অপবাদ, পূর্বজন্মের মিথ্যে পাপের ভার—সব সত্যি করিয়ে নিতে হবে এই জন্মেই।

কমলকে ভালবাসেনি। মিথ্যে সে ভান শ্যামাবাঈ করতে চায় না। একদিন ভাল লাগত। সে ভাল লাগার রঙ মনের মধ্যে বহুদিন ডুবে থেকে জলছবির কাঁচা রঙের মতই গলে গেছে।

তবু কমলকে চাই। তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে শ্যামাবাঈ। পুরুষের দেহে ক্ষত হয় না। কমল নষ্ট হবে না। গলে যাবে না। শুধু তার মনে ছোট্ট একটা ক্ষত শ্যামাবাঈ এঁকে দেবে। ফুটফুটে বউটা যখন বুকের মধ্যে নিবিড়তার আশ্রয় খুঁজবে তখনই ঐ ঘাটাতে সামান্য একটু চাপ পড়বে। চমকে উঠবে কমল। শিউরে উঠবে তার ওই ফুটফুটে বউটা।

শ্রাবণের ঝুলন পূর্ণিমা।

চাচীজী বললে:

—যাবি নাকি ঝুলন দেখতে?

—কি আর দেখব?

কথাটা বলতে বলতে শ্যামাবাঈ কিছু একটা ভেবে নিয়ে মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে :

—তুমি যাও নাকি প্রত্যেক বছর ?

—হুঁ, যাই, দু'এক ঘণ্টা ঘুরে আসি। গোবিন্‌জীর লীলা—চল্ না ?

—আচ্ছা যাব। সেই সন্ধ্যের পর ত', আমায় বাড়ী থেকে ডেকে নিও।

সন্ধ্যার পর চাচীজী এসে ডাকলে। সিঁড়ির অন্ধকার কোণে শ্যামাবাঈ লুকিয়ে বসে রইল। সাড়া দিল না।

—শামু কোথায়, বিন্নী ?

—তাই ত'!

নাম ধরে ভাইজীও ডাকলে বার কয়েক। তারপর বাড়ীর অর্ধাংশের ভাড়াটে পীরামলদের ওখানে খুঁজতে পাঠিয়ে দিলে দীপাকে। মিনিট খানেক পরে পার্টিশান পাঁচিলের ওপার থেকে দীপার আওয়াজ ভেসে এল।

—নেই ত' এখানে।

ভাবীজী খানিকটা বিস্মিত হয়ে বললে :

—তবে গেল কোথায়! আজকাল আবার মেয়ের যখন তখন পাড়া বেড়ান হয়েছে।

দীপা ফিরে এসে আব্দার ধরলে :

—আমি যাব নানীজী!

—যাবি চল!

ভাবীজী আপত্তি করলে একটু :

—অত ভীড়ে সামলাতে পারবে, চাচীজী ?

—পারব, পারব, সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। দু'ঘণ্টা পরে মে' কে ফিরে না পেলে বলিস।

নিঃশ্বাস চেপে সিঁড়ির কোণটাতে বসে সব কথা শুনলে শ্যামাবাঈ। বুকের মধ্যে তখন অদ্ভুত একটা ছন্দ আন্দোলিত হচ্ছিল। ভয়-লজ্জা-ঈর্ষা-বিদ্বেষে গড়া কি একটা কঠিন বস্তু যেন গলা আর বুকের মধ্যে কাঠের বলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছিল।

সন্তর্পণে সিঁড়ির কোণ থেকে নামলে শ্যামাবাঈ। ত্রস্তে একবার

চারিদিক দেখে নিয়ে নিমেষে খিড়কীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পায়ের ঠোকর লেগে একটু শব্দ হল দরজাটাতে।

ভেতর থেকে ভাবীজী বললে :

—কে রে?

এক পা ফিরে এসে শ্যামাবাঈ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মুহূর্ত কয়েক পরিস্থিতির আন্দাজ নিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

—তুমি!

কুট-কুট করে শ্যামাবাঈ অনেকক্ষণ দরজা নেড়েছে। ভেতরের ঘর থেকে কমল ঠিক বুঝতে পারেনি। দু-একবার সাড়া নেওয়ার চেষ্টা করে উত্তর না পেয়ে বিরক্তির সঙ্গে দরজা খুলে শ্যামাবাঈকে দেখে একটু চমকে উঠল কমল।

কমলের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে শ্যামাবাঈ দরজার একপাশে সরে দাঁড়াল।

—মা ত' তোমাদের ওখানেই গেছে, তোমায় নিয়ে ঝুলন দেখতে যাওয়ার কথা?

শ্যামাবাঈ ফিরে যাওয়ায় প্রত্যাশায় কমল সেখানেই অপেক্ষা করছে। দরজা বন্ধ করে ঘরে গিয়ে বসবে।

পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। উঠোনে জিয়েল গাছটার ওপরেই সে-আলোর অনেকখানি আটকে গেছে। বাকী আলোটা পাশের পাতকুয়া আর শ্যামাবাঈর মুখের ওপর পড়েছে কিছু কিছু।

কমল আবার কি একটা বলতে গেল যেন। কিন্তু তার আগেই শ্যামাবাঈ বললে :

—চাচীজী আমাদের বাড়ী গেছলেন, আমি জানি। আমি ঝুলন দেখতে যায়নি, ভাল লাগল না।

—বাড়ী যাবে?

কমলের স্বরে বোঝা যায় তার বুকের ভেতর টিপ্ টিপ্ করছে। অস্বস্তিতে জব্দ হয়েছে বেশ! মনে মনে হাসল শ্যামাবাঈ।

—না, একটু থাকব।

—একলা!

—তুমি ত' আছ? বাড়ীতে একলা একলা ভাল লাগল না। কেউ কথা বলে না।

জানে কমল। তার মমত্ববোধে সামান্য একটু নাড়া দিলে শ্যামাবাঈ।

—বসবে চল! আমি একটু আসছি বাইরে থেকে।

কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই কমল ঘরে ফিরে গেল। পরক্ষণেই গায়ে জামাটা গলিয়ে নিয়ে জুতো পরে বেরিয়ে এল সে।

দরজার কাছে এসে বললে:

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বস। আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

—না।

কমল বেরোবার আগেই দরজা ভেজিয়ে, দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে শ্যামাবাঈ দাঁড়িয়ে পড়ল। এতেই বুঝবে কমল। সব বুঝবে। নারীকৃত সামান্য অনুষ্ঠানেই পুরুষ সব বুঝে নেয়, নয় ত' প্রত্যেকটা মেয়েই বোবা কান্না বুকে চেপে মরে থাকত!

—ও কি!

কথার মধ্যে কমলের বিরক্তি ধরা পড়ল। ঢাকবার চেষ্টাও করেনি সে।

—কি করছ ছেলেমানুষী! রাস্তা দাও?

—না।

পেছন ফিরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে শ্যামাবাঈ আবার ঘুরে দাঁড়াল:

—কেন আমি সব দিকে সব সয়ে মরব? বছরের পর বছর তিল-তিল করে জলব। আর তোমরা—

বাকী কথাগুলো আর তার মুখ দিয়ে বেরোল না। সত্যিকারের কান্নার তলায় ডুবে গেল।

কাছে সরে এল কমল:

—কিন্তু আমায় কেন ওসব বলছ! আমি কি করেছি? কি করতে পারি?

—কিছু করনি—কিছুই করতে পারনা।

বিনা আমন্ত্রণেই কমলের বুকে কান্না মুছতে লাগল শ্যামাবাঈ। সঙ্কোচের সঙ্গে একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল কমল। কিন্তু কমনীয় পরিবেশটাকে

বেশীক্ষণ উপেক্ষা করতে পারলে না। শ্যামাবাঈরও বিশ্বাস ছিল পারবে না কমল। উঠোনের ওপর চাঁদের আলোর শয্যা, ঐ জিয়েল গাছ আর পাতকুয়াটাই সাক্ষী রইল শুধু।

সেই একটা মুহূর্ত। সেই প্রথম। সেই শেষ। বিন্দুর মত তার প্রান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিন্দুতেই বৃত্তের আভাষ। বৃহত্তরের পরিকল্পনা। সাধ-করে ডেকে আনা নিমেষের শৈথিল্য শ্যামাবাঈর সমস্ত জীবনের সুষ্ঠুতার ওপর কলঙ্কের আবরণ টেনে দিলে। নিজের ওপর ঘৃণার মাঝেও কিন্তু পরিতৃপ্তির স্বাদ পেল সে। ভাইজীকেও এর পর থেকে তেমন খারাপ মনে হয় না। তার ছোট ছোট মন্তব্যের টুকরোগুলো উটকো বেনো জলের মত মনে হয় না আর। এখন সেগুলো কানে আসে —সহজ, স্বচ্ছ, সাবলীলভাবে।

করুণার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে সে। চৌদ্দ-বসন্তের চতুর্দোলায় চড়ে আছে করুণা। খবর আসে সে সুখী হয়েছে। শুনে খুশি হয় শ্যামাবাঈ। করুণা বয়সে অনেক ছোট। তার সুখের কথা শুনলে মায়ের মত শ্যামাবাঈর চোখে জল এসে যায়। আনন্দাশ্রু।

—তুমি কি রোজই রাত করে বাড়ী ফিরবে ভাইজী ?

জলের ঘটিটা ভাইজীর সামনে নামিয়ে দিয়ে শ্যামাবাঈ গজ গজ করতে থাকে।

ক্লান্তির একটা হাই তুলে ভাইজী উত্তর দেয়ঃ

—কি করব বল ? কারবার ত' আমার জন্যে বসে থাকবে না। কাম্পিটিশনের মার্কিট, মাটি কামড়ে পড়ে না থাকলে—

কথা শেষ করতে দেয় না শ্যামাবাঈ:

—তবে সন্ধ্যে সন্ধ্যে খেয়ে আবার দোকানে চলে যেও ? বেশী রাত করে খেলে হজম হয় না।

ভাবীজী কতকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভাইবোনের এ ভাবান্তরটুকু উপযুক্ত ভাষায় মনের মধ্যে আলোচনা করতে পারে না। বুঝতে পারে না।

হাত মুখ ধুতে-ধুতে ভাইজী বলেঃ

—এবার থেকে সূর্যাস্তের আগেই ভোজন করে নেব। বয়েস অনেক হল, এবার একটু ধরম-করমে মন দেওয়া দরকার। কই গো—

দালানের একধার থেকে ভাবীজী বলে :

—হাঁ, দিয়েছি, তুমি বসবে এস। পাখাটা নিয়ে বাবুজীর সামনে বস, দীপা—

—ও কেন, ছেলেমানুষ! আমি যাচ্ছি—

একরকম ছুটে গিয়েই শ্যামাবাঈ পাখা হাতে ভাইজীর থালার সামনে বসে পড়ে।

খেতে খেতে তার দিকে তাকায় ভাইজী। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় ভাবীজীর দিকে।

—শামুর আর একবার বিয়ের চেষ্টা দেখি, কি বল? নয় ত' সারা জীবনটা ধরে কি করবে! এমন ত কত হিসটারী আছে। বাঙালী ঘরের বেবারও (বিধবার) আজকাল বিয়ে হচ্ছে!

খেতে খেতে ভাইজী হিসটারী আলোচনা করে। সমাজ সংস্কারের কথায় ডুবে যায়। পাখা নাড়তে নাড়তে শ্যামাবাঈর চোখ ছল ছল করে।

ভাইজী জানেনা। ছাদে দাঁড়িয়ে শ্যামাবাঈর সবুজ পাতা-ভরা জিয়েল গাছটার শীর্ষে নজর পড়ে। পুরান পাতা ঝরে নতুন পাতা গজিয়েছে। সে পূর্ণিমার চাঁদ কৃষ্ণপক্ষের মধ্যে ডুবে গিয়ে আবার নতুন করে উঠেছে। কমলের ফুট ফুটে বউটাকে মাঝে মাঝে ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ছাদের ওপর পায়চারী করতে দেখা যায়। তার সর্বাঙ্গে নিবিড় সুখের আলপনা। জিয়েল গাছের নীচে, পাতকুয়ার পাশে বাসি উঠানে কতবার ঝাঁট পড়েছে। আর কমল—পুরুষের দেহে ক্ষত হয় না। মনের ক্ষতটাও নিশ্চয়ই শুকিয়ে গেছে তার, কিংবা হয় ত সে-রাতটা একটা আঁচড়ও কাটেনি তার বুকে। বিস্ময়ের মাঝ থেকে নিজেকে মুক্ত করে কিছু ভাববার আগেই ত' তার সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নের দাগের চেয়েও হাল্কা রেখাটা মিলিয়ে যেতে সময় লাগেনি। চেষ্টাও করতে হয়নি তাকে। আপনিই সে মুক্তি পেয়েছে।

ভাবতে ভাবতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে শ্যামাবাঈ। খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ভাইজীর।

হাত গুটিয়ে নিয়ে ভাইজী বলে :

—কি হ'ল শামু !

শ্যামাবাঈর হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে সেটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে ভাবীজী তাকে হাত ধরে তুলে বলে :

—চুপ কর বাঈ, চুপ কর।

তারপর ভাইজীর দিকে তাকায় ভাবীজী :

—আচ্ছা, তুমি কি বল ত' ! ডাগর মেয়ের সামনে এই ভাবে বিয়ের কথা বলে, আর হিসটারী আওড়ায় !

শ্যামাবাঈকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ভাবীজী আবার প্রশ্ন করে :

—কি হল বল ?

উত্তর দেয় না শ্যামাবাঈ। কাঁদে। শুধু কাঁদে।

ভাবীজী গান জানত। কিন্তু গাইবার উপায় ছিল না। অশথ-পূজো আর কুমরের চাক-পূজোর মিছিল সঙ্গীত ছাড়া অন্য গান পছন্দ করত না ভাইজী।

—মে' মানুষ পূজো-পার্বণ আর ক্রিয়া-কর্ম ছাড়া আর কিসে গান গাইবে ? ঘরের বউ ত আর বাজারের বাঈজী নয় !

ভাবীজীর গুণগুণ গান থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তবু নিজের সঙ্গীতগুলোকে শ্যামাবাঈ আর করুণার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল ভাবীজীর। ভাইজী যখন বাড়ীতে না থাকে তখন তাদের শেখাবার চেষ্টা করত ভাবীজী। করুণার শিক্ষণশক্তি তেমন ছিল না, কিন্তু শ্যামাবাঈকে একটা গান দু'বারের বেশী তিনবার শেখাবার দরকার হত না।

শ্যামাবাঈ কাঁদে। শুধু কাঁদে। শেষ পর্যন্ত ভাবীজী বিরক্ত হয়ে বলে :

—দিনরাত শুধু একঘেয়ে সুরের কান্না। কাঁদবিই যদি গান গেয়ে কাঁদ।

তারপর বিদ্যাপতি সঙ্গীত শিখিয়েছিল ভাবীজী। সব কথার অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু সুরের মধ্যে আত্মসমর্পণের ভাবটা ফুটে ওঠে। ওটাকেই দিনরাত আঁকড়ে থাকতে চায় শ্যামবাঈ।

গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি—কিন্তু শ্যামাবাঈর দোষ বহু নয়।

একটা। ছোট্ট একটা বিভ্রান্তি। দিন-দিন ওটাই গলিতকুষ্ঠের মত সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। মনের অঙ্গ-আত্মমর্যাদা, নারীত্ব, সুষ্ঠু জীবনের অধিকারবোধ সব খসে খসে পড়ছে এক-একটা করে।

সোলেমানের লুগাঈ মাঝে মাঝে কাজ সংগ্রহ করতে আসে।

শ্যামাবাঈ, করুণা আর নিজের জন্য তাকে চুমকী বসান ওড়না তৈরী করতে দিয়েছে ভাবীজী। বাড়ীর দালানে চৌকাঠের পাশে বসেই কাজ করে সোলেমানের লুগাঈ। অবিশ্রান্ত হাসি আর অবিরাম কথায় গলে-গলে পড়ে।

হয়ত শ্যামাবাঈর খেদের ফাঁকটা পূর্ণ করবার জন্যেই ভাবীজীর এ আয়োজন।

শ্যামাবাঈকে ডেকে কাছে বসতে বলে সোলেমানের লুগাঈ :

—এখানে বস বাঈ, কথা বল। গল্প কর।

—কি কথা বলব ?

বসতে বসতে শ্যামাবাঈ প্রশ্ন করে।

সোলেমানের লুগাঈ হাসে :

—কথা যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে হাস।

—শুধু-শুধু !

—হাসি কি শুধু-শুধু হয় !

সোলেমানের লুগাঈ আবার হাসে :

—ভেতরে অনেক সুখ জমে থাকলে পরেই ত হাসি আসে। উনুনে আঁচ না থাকলে কি শুধু-শুধু ডালভাত টগ্‌বগ্‌ করে ফোটে ? তবে—

কিছুক্ষণ অনন্যমনে এদিক-ওদিক তাকায় সোলেমানের লুগাঈ। কিছু ভাবে। ভাবান্তর এসে যায় একটা। তারপর এদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখে শ্যামাবাঈ এদিকেই তাকিয়ে আছে।

তখন আবার বলে :

—তবে সুখ হচ্ছে শয়তান। সহজে ধরা যায় না। ঝড়-তুফানের তলায় বাসা করে বসে থাকে। ওগুলোকে জিততে না পারলে কিছুই হয় না। আমিই কি হাসতে পারতুম !

হাসে, হাসে সোলেমানের লুগাঈ :

—তিনটে বাচ্চাকে জলে ভাসিয়ে ইদ্‌রিস্ চলে গেল। একটুখানি খুঁটি-নাটিতেই বললে, তাল্লাক-তাল্লাক-তাল্লাক। তখন হেসেছি। ইদ্দাত কাটতে না কাটতে তিনটে বাচ্চা নিয়ে সোলেমানের গলায় ঝুলে পড়লুম। সোলেমানও ত' একটা বাচ্চা! তবু আমার মিঞা। চাচার ছেলে। ছাগল দুয়ে তাকে কত দুধ খাইয়েছি। সুখ কি পেত সোলেমান—আমি হাসি, তাই ও রংরেজ গুণ-গুণ করে গান গায়। কাপড় ছোপায়। ইদ্‌রিসের বাচ্চাদের দানাপানি দেয়। তবু ও বাচ্চাই।

গল্প শুনতে শুনতে বিচিত্র বিভ্রান্তিতে শ্যামাবাই জড়িয়ে যায়। হাসি কোথায় সোলেমানের লুগাঈর জীবনে! তবু ও হাসে কেন?

আবার বলে সোলেমানের লুগাঈ :

—সকিলাবাজী ত' রোজ দিল্লগী করে বলে :

সোলেমানের বিবির ক' ছেলে?

সোলেমানকে নিয়ে চার ছেলে!

ছড়াটা শুনে শ্যামাবাঈ হাসিতে ফেটে পড়ে। থামতে চায় না। সোলেমানের লুগাঈর মুখটা সেই হাসিতে চক্‌চকে হয়ে ওঠে!

সোলেমানের লুগাঈ বলে :

—হাস বাঈ, হাস। সুখে হাস, বারবাদিতে হাস।

ভাবীজী কাছে এসে দাঁড়ায় :

—কি হল?

—কিছু নয়।

ছড়ার আদি রসটা মনে পড়তে ভাবীজীর সামনে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে শ্যামাবাই।

ভাবীজীকে দেখে সোলেমানের লুগাঈর একটা কথা মনে পড়ে যায় :

— এবার বাঈর সাদী দাও, ভাবীজী?

—হুঁ, ওর ভাইজীও ত' সেই কথাই বলছে। চেষ্টা করছি।

—এখন ত তোমাদের ফাগুন মাস—গণগোরীতে পাঠাও না কেন বাঈকে?

ভাবীজী চুপ করে থাকে। কথাটা মনে ধরে তার।

—ঠিক ত' ! পাঠাব, পাঠাব—কাল থেকেই যাবে।

শ্যামাবাঈর সম্মতি না নিয়েই ভাবীজী সেখান থেকে চলে যায়।

সোলেমানের লুগাঈ বলে :

গণগোরীতে গেলে দেবতাদের বাদশা শিউজীর মত মিঞা হয় বাঈ।

শ্যামাবাঈ ভিজে হাসি হাসে :

—তাই নাকি ?

—হাঁ, হাঁ, হয়, জরুর হয়।

ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী নারীর মত কথা কয়টা বলে সোলেমানের লুগাঈ আর বসল না। হাতের কাজ গুটিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। বেলা অনেক হয়ে গেছে। হয়ত বাচ্চাগুলোর সঙ্গে বাচ্চা সোলেমানও খিদের জ্বালায় ফোঁস ফোঁস করছে।

মায়া মাখান হাসিভরা মুখটা নিমেষে দরজার আড়ালে হারিয়ে গেল। ঐদিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে শ্যামাবাঈ বসে রইল। সোলেমানের লুগাঈর একটা কথা ঘুরছে তার মনের মধ্যে। সুখ-শয়তান সহজে ধরা দেয় না। কিন্তু ঐ শক্ত জিনিসটাকেই আয়ত্ব করবে শ্যামাবাঈ। করতেই হবে। সামান্য একটা ছিদ্র হয়ে গেছে বলে জীবনের প্রথম জোয়ারের মুখেই নৌকাডুবি হতে দেবে না সে।

এর পরের কথা মহাদেও খেতন জানেন। দৃষ্টির সেতু বয়ে পরিচয়। গানের আকর্ষণে নৈকট্য। তারপর জীবনের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে সামান্য একটু স্পর্শ। আবেশে পরিশোধিত দুটো কথা।

পরিচয়, নৈকট্য, স্পর্শ—এর কোনটাই নাড়া দেয়নি শ্যামাবাঈকে। মনে হাওয়া একটু লেগেছে হয়ত, কিন্তু তরঙ্গ তোলেনি।

সেই ঝুলন পুর্ণিমার সন্ধ্যায় লব্ধ ছোট্ট দাগটি মাঝে মাঝে এক ধরণের চিন্তার খাঁজে খাঁজে প্রতিফলিত হয়ে অনেক বড় মনে হয়। বাঁকা-চোরা জায়গায় ছোট্ট ছায়াটা যেমন দানবের আকৃতি নেয়, তেমনি। তুলনায় এই নতুন সম্বন্ধটা কিছুই নয়। এক পুরনো ঘটনার ক্ষয়ে যাওয়া ছায়া মাত্র। ভুলে যেত শ্যামাবাঈ। সোলেমানের লুগাঈর দেওয়া বীজমন্ত্র জপ করতে করতে সব ভুলে যেত। কিন্তু তা হল না। দুটো কথা

বল্লেন মহাদেও খেতন। তু মেরী লুগাঈ! অন্য কিছু বললে না কেন লোকটা? কথার পরিবর্তে তাকে নির্জন দরদালানে ফেলে নিষ্পেষিত করলে না কেন? ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের পাতার মত নিমেষেই সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যেত। সামান্য কালির চিহ্ন থাকত না দেহ-মনে। ছুটো হাসির ঘসানি দিয়ে তুলে দিত সব। কলঙ্ক-তোলা তামার বাসনের মত স্বর্ণাভ আলোয় ঝলমলিয়ে উঠত।

কথায় কথায় সতীত্বের মহিমা গায় নন্দাকুকু। পাঁচ-সাত বছরের মেয়েগুলো পর্যন্ত তার মুখের দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়ে থাকে। কথা গেলে। বোকার মত মুখ করে সতীত্বের ফল চাকা শিখতে থাকে।

নন্দাকুকুর লেকচার বেড়ে যায় গণগোরীর সময়। পাড়ার ছোট বড় মেয়েগুলোকে ডেকে কুমারীত্ব বোঝায় তখন। নারী পুরুষের ব্যবধান বোঝবার আগেই ছোট ছোট মেয়েগুলো কুমারীত্ব, সতীত্বের দুর্ভেদ্য সংজ্ঞা রপ্ত করে নেয়!

—গণগোরীতে তারাই যেতে পারে যে মেয়ে সত্যিকারের কুমারী। কুমারী মানে যে মেয়ে কোনদিন ব্যাটাছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

কাপড়-চোপড় ঝেড়ে-ঝুড়ে বেশ যুৎ করে বসে নন্দাকুকু।

—যে মেয়ের গায় কোন বেটাছেলের নিঃশ্বাস পড়েনি। আর যে মেয়ে কুমারী নয় সে যদি গণগোরীতে যায়, তাহলে অমঙ্গল হয়। ঘোর অমঙ্গল হয়।

পুঁচকে দীপাও একদিন সমবয়সী মেয়েগুলোর সঙ্গে নন্দাকুকুর কথা গিলছিল। ধমক দিয়ে তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে শ্যামাবাঈ বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

—ওকে তাড়ালি কেন?

খুবই বিরক্ত হয়ে নন্দাকুকু বললে।

শান্ত স্বরে শ্যামাবাঈ উত্তর দিলে:

—ও এখন ছেলেমানুষ; বয়সের আগে বিদ্যে শিখলে ফল হয় না।

—না!

নন্দাকুকু অকারণেই ক্ষেপে উঠে বললে:

—বয়েসের পর বিদ্যে শিখে তোর মত সতী হয়? তাই বিয়ের আগেই স্বামী মরেছে তোর!

—কি বললে তুমি আমায়!

বিস্ময় আর ঘৃণায় শিউরে উঠে চীৎকার করে উঠল শ্যামাবাঈ।

এসব আগেকার কথা। তখন শ্রাবণ পূর্ণিমার সেই সন্ধ্যাটা শ্যামাবাঈর জীবনে আসেনি।

নন্দাকুকুর বিচারে যাই হোক, সোলেমানের লুগাঈর দেওয়া মন্ত্রগুণে শ্যামাবাঈ মনে করতে পারত সে কুমারী। শয়তানের মত দুর্জয় সুখটাকে সে সেই মৃত্যুরূপী স্খলনটার ওপর জিইয়ে রাখত। কিন্তু মহাদেও খেতনের ঐ কথা তাকে বিভ্রান্ত করে দিলে। একটা চিরন্তন সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে তাকে পাগল করে তুললে। মৃত্যুর পরেও যে সম্পর্ক কাটে না, বরং নানা বিধি-বিধানে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়।

সেদিন যদি ঐখানেই শ্যামাবাঈ মরে যেত তাহলে বলবার কিছু থাকত না। মরেনি—তার জায়গায় এগার দিন সমানে ছট্‌-ফট্‌ করেছে। ঘুম হয়নি। এক সেকেণ্ডের জন্যও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারেনি। প্রথম দু-একটা দিন গুম্‌ হয়ে বসে থেকেছে। তারপর নিত্য নতুন উপসর্গ।

কেঁদেছে। আবল-তাবল বকেছে। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরে ভীষণ কাঁপুনি। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ নিজে থেকে দেহটা অত কাঁপাতে পারে না। পাড়ার লোকের ভীড় জমে গেছে বাড়ীতে।

ভেতরে ভেতরে সব বুঝতে পারছিল শ্যামাবাঈ। কিন্তু নিজেকে আয়ত্বে আনতে পারছিল না কিছুতেই। মহাদেও খেতনের কথাটা সর্বদাই তার সামনে রূপ ধরে এসে দাঁড়াত। সীমন্তিনী শ্যামাবাঈর হাত ধরবার জন্যে সাদরে হাত বাড়িয়ে দিতেন মহাদেও খেতন। ব্রীড়ার আতিশয্যে শ্যামাবাঈর মুখ মাটির দিকে ঝুলে পড়ত। কাছে এগিয়ে আসতেন মহাদেও খেতন। এমন সময় ভীষণ এক ক্ষুধাতুর দৃষ্টি নিয়ে কমল এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ত। শ্যামাবাঈকে গিলে খেতে চাইত সে।

আঁতকে উঠত শ্যামাবাঈ :

—না, না, তুমি চলে যাও !

ফাঁকা একটা কোণের দিকে শ্যামাবাঈর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভাবীজী বা অন্য কেউ হয়ত বলত :

—কে ! কেউ ত নেই ওখানে ?

—ঐযে ! ওকে চলে যেতে বল, চলে যেতে বল—

সকাতরে তার হাত ধরে শ্যামাবাঈ অনুনয় করে।

ভাবীজী বুঝতে পারে, কোথাও গোলযোগ ঘটেছে। শ্যামাবাঈকে নিরস্ত করবার জন্যে বলে :

—আমি যেতে বলেছি, তুই ঘুমো।

—ঘুম ! ঘুম ত' শ্যামাবাঈর হবে না– আর ঘুমোবে না শ্যামাবাঈ।

শ্যামাবাঈ তখন নিজের ভেতরকার অস্পৃশ্য অদৃশ্য আত্মাটাকে আলাদা করে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যার ঘুম হবে না বলছে সে অন্য শ্যামাবাঈ। এ শ্যামাবাঈ তার কেউ নয়।

এতক্ষণে রোগ ধরতে পারে রামীয়ার দাদী। মনে-মনে একটা মন্ত্র জপ করে নিয়ে কাছে এসে শ্যামাবাঈর হাত চেপে ধরে।

—বল্ তুই কে ?

—আমি-আমি—

শ্যামাবাঈর হাত দুটোতে সজোরে ঝাঁকানী দেয় রামীয়ার দাদী :

—বল্, বল্, তুই কে ?

তারপর রামীয়ার দাদী অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলে :

—সহজে কি বলবে ! চেপে ধরতে হবে। এ 'বায়ু'—হাওয়া লেগে গেছে।

নকক্কর মা বলে :

—রুগীর সামনে এ সব কথা বলতে নেই, রামীয়ার দাদী।

রামীয়ার দাদী হাসলে :

—বল আর না বল ! কানা মনে-মনে জানা—বল্, কে তুই ?

রামীয়ার দাদী বুড়ো হাড় দিয়ে শ্যামাবাঈর হাত দুটো নির্মম ভাবে নাড়াতে থাকে।

কমলের মা, ও বাড়ীর চাচীজী বললে :

—সহজে কি বলবে! যখন সরষে পড়া পড়বে, তখন বলবে।

—ওকে খেয়ে ফেলব আমি—

রামীয়ার দাদীর হাত ছাড়িয়ে কমলের মা'র ওপর পড়তে যায় শ্যামাবাঈ। পাঁচজনে ধরে ফেলে তাকে, কিন্তু অনাহার-অনিদ্রায় আধমরা রোগীটাকে কেউ সামলাতে পারে না।

—খেয়ে ফেলব ওকে আমি।

তাদের কবলমুক্ত হয়ে চাচীজীর ওপর গিয়ে পড়ল শ্যামাবাঈ। চাচীজী ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে।

কিন্তু আর বিশ্বাস করা যায় না। সকলে মিলে শ্যামাবাঈকে বেঁধে ফেলল।

মন্তব্য করে :

—দড়িতে হবে না, করুণার মা, লোহার শেকল আন, দু'কাজই হবে।

এবার ভাবীজী আপত্তির হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে :

—না, আমি এভাবে বাঁধতে দেব না। আপনারা যান আমার বাড়ী থেকে।

শ্যামাবাঈর বন্ধন পরীক্ষা করতে-করতে রামীয়ার দাদী বলে :

—না, বললে ত' হবে না করুণার মা। এসব হাওয়া আমি অনেক দেখেছি, শেষে কাউকে খুন-টুন করে রাখুক! আর অত মায়া কেন? যত মায়া দেখাবে ভেতরের হাওয়া ততই চেপে বসবে। শুধু মার লাগাও-মার—

ততক্ষণে শ্যামাবাঈকে জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেছে। হঠাৎ রামীয়ার দাদী লাফিয়ে এসে তার গালে একটি চড় মেরে দূরে সরে গেল।

—আমি আজ রজৌনে খবর পাঠিয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই রামরূপ ওঝাকে আনাচ্ছি—তুমি কিচ্ছু ভেব না করুণার মা।

ভাবীজীকে আশ্বাস দিয়ে দলবল নিয়ে রামীয়ার দাদী বেরিয়ে গেল। ভীড় কেটে গেল একে-একে। পাথরের মূর্তির মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ভাবীজী।

—আমায় খুলে দাও ভাবীজী, খুলবে না ?

—খুলব বাঈ, খুলব।

তাড়াতাড়ি সদর-দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে ভাবীজী শ্যামাবাঈর বন্ধন খুলে দিলে। ইতিমধ্যে হাত দুটোতে কালশিরা পড়ে গেছে। শ্যামাবাঈকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ভাবীজী তার দেহে হাত বোলাতে থাকে।

—তোর কি হল বাঈ ?

ভাবীজীর চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জলের ফোঁটা শ্যামাবাঈর কোলের ওপর পড়ে।

—আমার কি হল ?

নির্বোধের মত শ্যামাবাঈ ভাবীজীকেই প্রশ্ন করে।

শ্যাবাবাঈর আপন কাকা রামকুমার চাচা। পিতামহ-পিতামহীর মহান আত্মার ভর হয় তার ওপর। নানা রকম নির্দেশ দেয় তারা। রোগের নিদান বলে দেয়।

ভাইজীর সঙ্গে রামকুমার চাচার বনে না। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আতুরে নিয়ম নাস্তি। আপদে বিপদে বৈরি ভাবটা কেটে যায়।

সেই দিনই দুপুরের দিকে ভর হয়েছিল রামকুমার চাচার। ভাইজীকে ডেকে পাঠিয়েছিল নিজের বাড়ীতে।

তার সামনে গিয়ে ভাইজী করজোড়ে বললে :

—কৃপা করে বলুন আপনি কে ? কেন আমায় ডাকলেন ?

—আমি লোকনাথ।

ভাইজী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। সমবেত প্রত্যেকেই প্রণাম করল রামকুমার চাচার অন্তরাত্মাস্থিত লোকনাথজীর মহান আত্মাকে।

—হুকুম করুন দাদাজী।

আবার ভাইজী রামকুমার চাচার পা জড়িয়ে ধরল।

—শ্যামাবাঈ।

হাঁ, শ্যামাবাঈ।

রামকুমার চাচার নীমিলিত চক্ষু খুলে গেল। দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। প্রাণের সমস্ত চিহ্ন চোখ দুটো থেকে অন্তর্হিত।

—শ্যামাবাঈর হাওয়া লেগেছে। বিকানীরের ঘি'ওয়ালা তার ওপর জুলুম করছে। উপভোগ করছে।

ভাইজী ডুকরে কেঁদে উঠল। বার-বার রামকুমার চাচার পায়ে মাথা কুটলে :

—উপায় করুন, দাদাজী—উপায় করুন।

উত্তর নেই। কিছুক্ষণ নীরবতার মাঝে কেটে গেল। হঠাৎ থর্‌-থর্‌ করে রামকুমারের দেহ কাঁপতে লাগল। তারপর গলার স্বর বদলে গেল। ভেতর থেকে কে যেন নারী কণ্ঠে কথা বলতে চাইছে।

—কে, দাদীজী?

—হাঁ।

—ভাল ওঝা ডাক। আর যে ঘরে শ্যামাবাঈ থাকে তার চার কোণে চারটে পেরেক পুঁতে দাও। ঘরের মধ্যে ঘুঁটের ধোঁয়া দিও। আর—

—আর।

মনের খাতায় প্রত্যেকটা নির্দেশ ভাইজী টুকে নিচ্ছে।

কালিথানের চবুত্রায় শিউজীর যে ত্রিশূল পোঁতা আছে, সেটা ধুয়ে জল খাইয়ে দিও। আর দিনে রাতে শ্যামাবাঈকে একলা রেখ না। পাঁচজন—অন্ততঃ পাঁচজন পাহারা যেন সব সময় থাকে।

বাড়ীতে এসে সমস্ত বিবৃত করলে ভাইজী, আর সাধ্যমত আপত্তি করলে ভাবীজী। ভাইজীর ধর্ম আর ভৌতিক বিশ্বাসটাকে বজায় রেখে যতদুর সাধ্য উপযুক্ত চিকিৎসার আয়োজনের জন্য ভাবীজী ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—কবিরাজ গোপাল শর্মাকে ডাক। ঘুমের ওষুধ দিক। সব ভাল হয়ে যাবে।

—ভূতকে ঘুমের ওষুধ!

—কিন্তু ঐ সব করতে-করতে বাঈ যে মরে যাবে?

ভাইজী কঠোর স্বরে বললে :

—তোমার দরদ নিয়ে তুমি থাক। মরে মরুক। আমি ভূত তাড়িয়ে তবে ছাড়ব।

অতএব সন্ধ্যার পর রজৌনের ওঝা এল। তার ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু আর শ্যামাবাঈর মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মাঝরাতে কলঘরে যাওয়ার নাম করে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এসেছিল এইখানে। সব বলতে এসেছিল মহাদেও খেতনকে। বলা হয়নি।

তারপর। তারপর ভাবতে গেলে শ্যামাবাঈর মাথা ঝিম-ঝিম করে। কিছু বুঝে উঠতে পারে না। তাকে ঘিরে বাড়ীর সব লোকের পরামর্শ। বিশ্বসংসারের উদ্বেগ। ওঝার অত্যাচার। ভাইজীর চাবুক। বিকানীরের প্রেতাত্মাকে চাবকে শায়েস্তা করবে ভাইজী। রেলপ্ল্যাটফরমের ওপর সমস্ত অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

ভাবীজী সহ্য করতে পারেনি। প্রতিকারে ব্যর্থ হয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে। যাবার সময় শুধু একটা কথা বলে গেছে শ্যামাবাঈকে।

—বাঈ, ওখানে গিয়ে যেন খবর পাই, তুই মরে গেছিস।

শ্যামাবাঈ বুঝতে পারেনি। অবোধ পশুর মত দৃষ্টি তুলে ভাবীজীর মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে ছিল।

সব কথা বলতে এসেছিল শ্যামাবাঈ। বলে চলে গেছে। তার অসংলগ্ন প্রলাপগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে একটা সম্পূর্ণ গল্পের আকার দেওয়ার চেষ্টা করেন মহাদেও খেতন। গল্পটা এসে এক জায়গায় থেমে যায়। কমলের উপাখ্যানটাকে তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না। কিছুক্ষণ আগেই শ্যামাবাঈর চোখের নীচের কালশিরার ওপর চুম্বন করেছেন। তার হাত ধরেছেন। এখন হাত আর ঠোঁট ঘৃণার আগুনে জ্বলছে। এক-এক পর্দা চামড়া তুলে দিলে যেন শাস্তি হয়।

ভুল করেই হোক, কিংবা আচম্বিতের মোহেই হোক শ্যামাবাঈর জীবন পথে এক ক্ষণিকের অতিথির পদচিহ্ন পড়েছে। মাটির পবিত্রতা তার নষ্ট হয়ে গেছে। সার্বজনীনতার পাঁকে ডুবে গেছে শ্যামাবাঈ। ওখানে ক্ষমা নেই। শ্যামাবাঈকে আর কোন মতেই গ্রহণ করতে পারেন না

মহাদেও খেতন। কেনা মাটি নিয়েই তাঁর জীবন। সেখানেই তিনি গৃহ রচনা করবেন। পথে ঘাটে বাসাড়ে বেদের মত শিবির স্থাপন করবেন না।

তখন কিছু মনে হয়নি। এখন সমস্ত শরীর রী-রী করছে। চম্পাবাঈ আর শ্যামাবাঈকে এক করে দেখেছিলেন তিনি। এখন দু-জনে তাঁর দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘরে ঢুকলেন দাদীজী। মহাদেও খেতনকে চমকে দিয়ে ডাকলেন।

—মুন্না।

—দাদীজী!

—অন্ধকারে কি করছিস মুন্না?

বাইরের সামান্য আলোয় ঠাওর করে দাদীজী এগিয়ে এসে মাথায় হাত রাখলেন। জপ্ করলেন মনে-মনে।

—শ্যামাবাই কখন গেল?

মহাদেও খেতন একটু বিস্মিত হলেন যেন!

—তুমি জানতে ও এসেছিল?

—হাঁ, আমি ত' কতবার বাইরে থেকে ঘুরে গেছি। টের পাসনি তুই।

দাদীজীর ভাষায় সন্দেহের ছোঁয়া নেই। মহাদেও খেতন উঠলেন। উঠে আলো জ্বাললেন।

তারপর দাদীজীর কাছে এসে আস্তে-আস্তে, যেন নিজেকেই বললেন:

—শ্যামাবাঈকে ভুতে ধরেনি—ও'পাগল হয়ে গেছে।

দাদীজী বিশ্বাস করলেন না:

—তুই কি করে বুঝলি? ওঝা ত' বলে—

কথা শেষ করতে দিলেন না মহাদেও খেতন:

—ওঝা ভুল বলে। আর ভূত যদি হয়, তা বিকানীরের ভূত নয়, ওর স্মৃতির ভূত। হয় ত' এই ভূত আমাকে ধরবে দাদীজী।

মহাদেও খেতন শেষের কথাগুলো বলবার সময় হাসতে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভেতরে হাসি নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত তখন তিনি সারা ঘরময় পায়চারী করছেন।

দাঁড়িয়ে বসে মহাদেও খেতন ঘেমে ওঠেন। মাথার চুল ছেঁড়েন দু'হাতে। মাথা গরম হয়ে যায়। কেনা মাটি ছাড়া খেতনরা কখনও অন্য জায়গায় পা রাখেনি। আর শ্যামাবাঈর মনোরাজ্যে কয়েকদিন ভ্রমণ করে মনে হচ্ছে ঐ কটা দিন বাসা বাড়ীতে কাটিয়ে এসেছেন। অবাঞ্ছিতের নিঃশ্বাসে ভরা বাসাবাড়ী, যার প্রতিটি ইঁটের পাঁজরে অন্যের সুস্পষ্ট স্পর্শের ছাপ আঁকা আছে!

দু'একদিনের মধ্যেই খবর আনলেন দাদীজী। গতরাত থেকে শ্যামাবাঈকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে সে।

মহাদেও খেতন পায়চারী বন্ধ করে শান্ত হয়ে চেয়ারে বসলেন।

—পাওয়া যাচ্ছে না? খোঁজ করছে না কেউ? পুলিশে খবর দেয়নি?

জানালার বাইরে আকাশ। আকাশের বাইরে শূন্যলোক। সেই শূন্যলোকের দিকে তাকিয়ে দাদীজী বললেন:

—কি জানি কি করছে না করছে! যার নিজের ভাই খেয়াল করে না, পাড়ার লোক তার জন্যে আর কি করবে?

নেহাত কথার উত্তর দিতে হয় তাই মহাদেও খেতন বললেন:

—নিজের ভাই খেয়াল করছে না?

—তাই ত শুনছি।

—তুমিই বা মিছিমিছি মাথা ঘামাও কেন? দুনিয়ায় কত লোক ত' রোজ হারিয়ে যাচ্ছে, কে তার কি করছে!

—এই তোর কথা হল?

একটু চুপ করে দাদীজী রাগ সংযত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না:

—যে মেয়েটার সঙ্গে দু'দিন আগে ঘরের দরজা বন্ধ করে গল্প করলি, সে আজ হারিয়ে গেল, আর তোর কাছে এটা কিছু নয়?

মহাদেও খেতন উত্তর দিলেন না। বলবার ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরের দরজা বন্ধ করে গল্প না করলে আজ হয়ত উদ্বিগ্ন হতেন তিনিই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এই কথার সূত্র ধরে

আলোচনার ধারা কোন্‌দিকে বইবে তা অনুমান করে চুপ করে রইলেন। আর নিজের অপমানটাকে জাহির করেই বা লাভ কি?

আরও কিছু বলতে চাইছিলেন দাদীজী। কিন্তু মহাদেও খেতন নীরব হয়ে রইলেন। পাষাণের মত নীরব।

তবুও দাদীজী শেষ চেষ্টার মত করে বললেন:

—আমার ত একটা কর্তব্য আছে। বেচারী কাছে এসে বসত, গান শোনাত ঠাকুরকে।

দাদীজী নড়তে চান না। অথচ ছুটি চান মহাদেও খেতন। মানুষের সামনে থেকে তিনি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও আড়াল হয়ে যেতে চান। ভাববেন। কি ভাববেন জানেন না। হয়ত মনে মনে বিষোদ্গারই করবেন শুধু, তবু একলা থাকতে চান।

হাঁ, কর্তব্য ত' আছেই। তুমি মুণিমজীকে গিয়ে বল পুলিশে খবর দেবে।

উত্তর শুনে দাদীজী চক্ষু বিস্ফারিত করলেন। এইজন্যে এত আয়াস করলেন তিনি; মুণিমজীকে গিয়ে বল।

—তাই যাচ্ছি মুন্না।

বিষাদ আর বিরক্তির সুরে কথা কটা বলে দাদীজী বেরিয়ে গেলেন।

ডাকের চিঠিপত্র মহাদেও খেতন বড় একটা খোলেন না। ব্যক্তিগত চিঠি আসেই না বলতে গেলে; যাও বা মাঝে মধ্যে এক আধটা আসে, টেবিলের ওপর দিন কয়েক পড়ে থেকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে চলে যায়।

আর ব্যবসা সংক্রান্ত বিধি পত্রের জন্য আছেন মুণিমজী। তিনিই পড়েন। তিনিই জবাব দেন। বৃদ্ধ মুণিমজী। এ বাড়ীর আত্মীয়ও বটে। তাঁর কাজে সন্দেহ করবার মত কিছুই নেই। তবুও তিনি কখনও-কখনও জোর করেন!

—এ চিঠি পড়ে দেখে জবাব দিও।

—কেন তোমার চোখে ত' চশমা আছে মুণিমজী?

মাতামহের সম্পর্ক নিয়ে কৌতুকের মধ্যে দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে চায় মুণিমজী।

—আছে, কিন্তু এতে আর দেখতে পাচ্ছি না।

—তাহলে আমার খরচে চশমা বদলে নাও—কিন্তু ঐ সব চিঠি ফিঠি পড়ার হাত থেকে রেহাই দাও আমাকে।

—তা নয় নাই পড়লে, কিন্তু জবাবটা লিখে সই করে দেবে ত'?

মহাদেও খেতন গম্ভীর হলে মুণিমজীকে 'আপনি' সম্বোধন করেন:

—ও আপনি করবেন।

—তোমার সইটাও কি আমি করব?

—হুঁ।

—জাল সই!

— কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম, আমি বললে তাতে দোষ কি?

তারপর একটু তামাসা করেন মহাদেও খেতন:

—কি মুণিমগিরি করছ! সামান্য একটু জাল-টাল করতে পার না। আমি মুণিম হলে মালিকের সমান এসটেট্ করে ফেলতুম।

—তা বলতে!

মুণিমজী হাসলেন হা-হা করে। ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে তাঁর থুথু ছিটিকে পড়ল।

—তা বলতে! এত বড় এস্টেট্ লাটে উঠে যাচ্ছে, সামলাতে পারছ না, আর মুণিমগিরি করে এস্টেট্ করতে?

হাসিতে হাসি আসে। মহাদেও খেতন হাসলেন:

—যার নেই সে গড়ে। যার আছে সে ওড়ায়। দাদাজী লোটা-কম্বল সম্বল করে মাড়োয়ার থেকে এসেছিলেন—কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে মরলেন। তারপর দু'পুরুষ কাটেনি, সেই কোটি লাখের কোটায় নেমে এসেছে।

মুণিমজী বললেন:

—তার জন্যে দায়ী তোমার বাবার উড়নচণ্ডে স্বভাব, আর তোমার গাফিলতি। আমরা—আমলা গোমস্তরা, হিসেব রাখতেই পারি, খরচে ত' আর বাধা দিতে পারি না।

বৈষয়িক কথাবার্তা আর ভাল লাগল না। মহাদেও খেতন বললেন :

—তোমার এখন বয়স হয়েছে নানাজী। এবার বল, জয় গোপাল-জয় গোপাল।

—তাহলে চিঠি তুমি সই করবে না ?

—বললুম ত' জাল কর। বুড়ো লোককে আর কত শেখাব ?

কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে মুণিমজী প্রস্থানোদ্যত হলেন।

সেদিকে তাকিয়ে মহাদেও খেতন বললেন :

—আমি বলি কি মুণিমজী, এইবার তুমি ছুটি নাও।

যেতে গিয়ে ফিরে এলেন মুণিমজী :

—এই সব সামলাবে কে ?

—তোমার কাগজ-পত্তর ত'—অগ্নি দেবের চার্জে দিয়ে দাও, উনি সব সামলাবেন। ওঁর চেয়ে পাকা মুণিম আর কেউ নেই।

বিরক্তির উত্তেজনাটা মুণিমজী পায়ের পাতায় সংযুক্ত করলেন। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে সেদিকে তাকিয়েও গম্ভীর হয়ে গেলেন মহাদেও খেতন। কি হল তাঁর। চেষ্টা করেও হাসিটাকে ধরে রাখতে পারেন না।

ছায়ার মত শ্যামাবাঈ যেন সর্বদা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে। হারিয়ে গিয়ে আরও কাছে সরে এসেছে সে। মাঝে-মাঝে চমকে ওঠেন মহাদেও খেতন। দরজায় খুট করে একটু শব্দ হলেই সেদিকে তাকিয়ে দেখেন।

দরজার ওপর ঠুক-ঠুক করে করাঘাতের আওয়াজ হ'ল। প্রায় আঁৎকে উঠে মহাদেও খেতন সাড়া দিলেন :

—কে !

নিরুত্তরেই মুণিমজী উদিত হলেন। অপ্রসন্ন হলেও আশ্বস্ত হলেন মহাদেও খেতন।

—ওঃ, আবার !

তেজী ঘোড়ার মুখের রাশের মত নিজের মুখের রাশ মুণিমজী নিজেই টেনে রেখেছেন। কথা বললেন না। একটি চিঠি মহাদেও খেতনের সামনে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে চুপ করে রইলেন।

চিঠি। এককোণে বাবুজী সূর্যাপ্রসাদের সামান্য মন্তব্য দেওয়া আছে। পিতার হস্তাক্ষরের ওপর কেমন একটা আকর্ষণ আছে মহাদেও খেতনের। সব কিছুর ওপরই আছে। কোন দিন কাছে পাননি পিতাকে, ভেতরটা সেদিক দিয়ে সম্পূর্ণ রিক্ত। তাই তুচ্ছতম জিনিসেও পিতার স্পর্শের নিদর্শন পেলে মহাদেও খেতন কেমন আকুল হয়ে ওঠেন।

প্রথমে মন্তব্যটা পড়লেন—আমার মনে হয় তোমার একবার যাওয়াই উচিত, সূ।

সম্বোধনে কিছু নেই। নীচের দস্তখতটাও সম্পূর্ণ নয়। তবু মহাদেও খেতন ওটাই পড়লেন বার-বার। তারপর চিঠি।

কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছেন ফুফাজী—পিসেমশায়, শোভারাম নেওটিয়া। দীর্ঘচিঠি লিখেছেন শ্যালক সূর্যাপ্রসাদকে।

সূর্যাপ্রসাদজীকে আমার জয়গোপাল বঞ্চনা—

অত ধৈর্য নেই মহাদেও খেতনের। পিতার মন্তব্যটা স্মরণ করে চিঠিতে তার কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করলেন।

এক জায়গায় শোভারামজী লিখেছেন :

—বয়স আমার দিন-দিন বেড়েই চলেছে, এ-কথাটা আপনি বা আপনার ছেলে কেউই খেয়াল করেন না। তারপর আপনাদের গদীর অবস্থাও সুবিধের নয়—টিঁকিয়ে রাখতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। আপনার অংশ ত' প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যদি সম্ভব হয় মহাদেওজীকে পাঠিয়ে দেবেন, সব বুঝে নেবে।

খোলা চিঠি। আগেই পড়েছেন মুণিমজী। বন্ধ থাকলেও খুলে পড়তেন—সে অধিকার তাঁকে দেওয়া আছে। জবাব তিনিই দেবেন। কি দেবেন তার খসড়াও তৈরী। সইটা জাল করে দেবেন কি না সেটাই জানতে এসেছেন শুধু।

—এর উত্তর দিতে হবে নানাজী।

—উত্তর লেখাই আছে।

কি লিখেছেন দেখি ?

হঠাৎ কৌতূহলী হলেন মহাদেও খেতন। উত্তরটা নিয়ে পড়লেন। তারপর হেসে ফিরিয়ে দিলেন।

—এবার আপনার জবাব ঠিক হয়নি নানাজী। কাগজ আছে?

চিঠি লিখলেন মহাদেও খেতন। দুটি কথায় লিখলেন, এক হপ্তার মধ্যেই আমি যাচ্ছি, সে কটা দিন দয়া করে সামলে রাখবেন।

চিঠিটা পোস্ট করবার জন্যে মুণিমজীর হাতে দিয়ে মহাদেও খেতন বললেন:

—আপনি চিন্তিত হবেন না মুণিমজী। গদীটিকে সজ্ঞানে বৈকুণ্ঠধামে পাঠিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসব। তার আগে কাল পরশুর মধ্যে একবার দার্জিলিং যাব, মেয়ে দুটোকে ওখানে বোর্ডিংএ দিয়ে ঐ পথেই কলকাতা চলে যাব। আমার কিন্তু হাজার পঁচিশেক টাকা চাই।

—পঁচিশ হাজার!

—কেন নেই?

মুণিমজী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর ঝরাপাতার মত এক বিচিত্র করুণ সুরে হাসলেন:

—তার আর ভাবনা কি—গাছ কাটলেই কাঠ।

অর্থটা বোধগম্য হল না। মহাদেও খেতন সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

মুণিমজী বুঝলেন, তাঁর হেঁয়ালীটা মহাদেওজীর বুদ্ধির গণ্ডীর বাইরে। এবার ভাষাটা পরিষ্কার করলেন একটু।

—পঁচিশ হাজার ত'? একটা ছোট বাড়ী কোবালা করলে এখুনি পেয়ে যাব।

—তাই করে ফেলুন, শুধু শুধু সারা দুনিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকে কি লাভ? রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন মুণিজী?

মুণিজীকে সব জানতে হয়। অতএব রবীন্দ্রনাথকে তিনি জানেন। পড়ার কথাতেই বুঝলেন, অনেকগুলি ব্যবসা-পত্রিকার সম্পাদক তিনি। বোম্বাই আমেদাবাদে কাপড়ের মিল আছে। কলকাতাতেও জুট মিল কেনবার চেষ্টা করছেন! যখন ভোপালনগর সুগার মিলের ম্যানেজিং ডাইরেকটর ছিলেন—

মহাদেও খেতন থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

—না, না, সে রবীন্দ্রনাথ নয়, আমি সেই রবীন্দ্রনাথের কথা বলছি

যিনি গুড়ের মিল করে লাখ টাকা দেনা করেছিলেন, পাটের কারবার করতে গিয়ে ফেল হয়েছিলেন—তারপর বললেন :

ধন নয় মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা—
শুধু ভালবাসা
করেছিনু আশা।

অতঃপর মহাদেও খেতন অর্থটা ভাল করে মুণিমজীর নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন।

এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মুণিমজী ; বললেন :

—মুখ্যু মানুষের খবর আমি রাখি না, অত সময় নেই। ভুখা প্রেম মানে ভুখা বাচ্চা, ভুখা বাচ্চা মানে ভুখা হিন্দুস্থান।

মহাদেও খেতন উঠে গেলেন বইএর সেল্‌ফের দিকে। রবীন্দ্র কাব্যের একটা খণ্ড খুঁজে বের করলেন, তারপর এদিকে ফিরলেন।

—আমি মুখ্যু, কোনদিন স্কুলে পড়িনি—তাই মুখ্যু মানুষকে এত ভালবাসি।

—আমি যাই ?

—ও হাঁ, নিশ্চয়ই, তবে যে কি বললেন—গাছ কাটলেই কাট, এর ব্যবস্থাটা ?

মুণিমজীর প্রাণান্ত হচ্ছে যেন, এক রকম ছুটেই বেরিয়ে গেলেন।

সে হবে, সে হবে।

শতাব্দী পোরোয়নি। মাত্র তৃতীয় পুরুষে এসেই এত বড় বাড়ীটা একটা অস্বস্তির বোঝার মত মনে হচ্ছে। দাদাজীর রক্ত কণিকায় গড়া তাই তাঁর সহ্য হয়েছিল। স্বস্তি পেয়েছিলেন। দাদীজীও এই ভিটেটা পতির পুণ্যবলে আঁকড়ে আছেন। কিন্তু বাবুজী পারেন নি। সূর্যাপ্রসাদকে কখনও এ বাড়ীতে রাত্রিবাস করতে দেখেছেন বলে মহাদেও খেতনের মনে পড়ে না। মা'র মোহ মাত্র তিন বছরেই কেটে গেছে। সংসার থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন তিনি। চম্পাবাঈ নিভে গেছে। শুধু তিনিই বত্রিশটা বছর এখানে কাটিয়ে গেলেন! জীবন-

তন্ত্রীতে শ্যামাবাঈ আঘাত না করে গেলে হয়ত' আয়ুর বাকী দিনগুলিও এখানেই খরচ করে যেতেন। ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেছে শ্যামাবাঈ।

ময়লা কাপড়ের পুঁটুলির মত মনের মধ্যে গ্লানির স্তূপ নিয়ে মহাদেও খেতন কলকাতায় চলে এলেন। মেয়ে দুটি কল্পনা আর মায়াকে রেখে এসেছেন দার্জিলিং-এর স্কুল-বোর্ডিংএ। খেতন পরিবারে রক্তের বন্ধন তেমন দৃঢ় হয় না। পিতার সঙ্গে মহাদেও খেতনের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। আসবার আগে দেখা পর্যন্ত করেননি তাঁর সঙ্গে। মনেও পড়েনি সেকথা। সূর্যাপ্রসাদ কোন খবর পেয়েছেন কি না তা তিনিই জানেন। মনে ত' হয় পাননি।

মায়ের প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। ও অধ্যায়টা সম্পূর্ণ অন্ধকার। তাঁর গর্ভের অন্ধকারে বত্রিশ বছর আগে মহাদেও খেতন বাস করেছেন। সেদিন যেমন মাকে চিনতেন না, আজও তেমনি চেনেন না। তাঁর জন্মের পর মা মারা গেলে তবু হয় ত' একটা কাল্পনিক স্মৃতি থাকত তাঁর মনে, কিন্তু তিনি বেঁচে থেকে সে সুযোগটা দেননি।

ভাবতে ভাবতে গোধূলি আকাশের গায়ে কাল মেঘের দাগের মত একটা ম্লান ছায়া নাচতে থাকে। মনের মধ্যেটা কেমন অন্ধকার হয়ে আসে।

অনেক দিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায়। তখন ছেলেবেলা। কোন মাটির মৌলিক অধিকারবোধের দম্ভ তখনও মনের মধ্যে জাগেনি। ঘুড়ি ধরা নিয়ে পাড়ায় একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল খুব। কি নাম যেন ছেলেটার—ভেদিয়া! হাঁ, ভেদিয়া। খুব প্রহার দিয়েছিলেন মহাদেও খেতন। নিজেও খেয়েছিলেন দু-চার ঘা। ভেদিয়াই প্রথম প্রহার করে।

ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মহাদেও খেতন তাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভেদিয়ার নাক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। মাথায়ও আঘাত লেগেছিল খুব। কিন্তু তবু মহাদেও খেতনের অপমান ঘোচেনি।

সেদিন ভেদিয়া মার খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ী গিয়েছিল:

—বলে দেব, বলে দেব আমি মাকে।

মহাদেও খেতন বলতে গিয়েছিলেন:

—আমিও বলে দেব মাকে।

কথাটা প্রায় নিজের অজ্ঞাতে বলেই ফেলেছিলেন। কিছুটা উচ্চারণ করে বদলে নিলেন।

—আমি রামধারী চৌবেকে বলে তোকে মার খাওয়াব। খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখব। পুলিস ডেকে ধরিয়ে দেব।

কিন্তু অত বলেও মনে শান্তি পাননি তিনি। বাড়ী ফিরে নালিশ করতে পারেন নি। ভেতর-ভেতর সান্ত্বনা খুঁজে ছিলেন তখন। মায়ের কাছ থেকে সান্ত্বনা। একটু তিরস্কারও হয় ত'। পাননি। তার বদলে শাসিয়ে এসেছিলেন! সান্ত্বনা লাভের স্থান ছিল না বলেই সেদিন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন তিনি।

আজ মনে হয় সেটা আরও বড় পরাজয়। মাকে জানেন না, কিন্তু রিক্ততাটাকে মাঝে-মাঝে অনুভব করেন। মনের মধ্যে একটা লজ্জাস্কর অনুভূতি জাগে সময় সময়।

মেয়ে দুটোর কথা সহজে মনে করতে পারা যায় না। মনে এলেও তাদের ছবি সহজে চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। মহাসাগরের বুকে শিশির কণার মত বড়া-হাবেলীর আনাচে-কানাচে মেয়ে দুটো কোথায় মিলিয়ে ছিল।

বোর্ডিংএ রেখে আসবার সময় কল্পনা-মায়াকে স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন মহাদেও খেতন :

— তামাদের মন কেমন করবে না ত'?

দু-জনেই প্রায় এক সঙ্গে মুখ খুলল। বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে তাকাল পিতার দিকে। মহাদেও খেতন ভেবে ছিলেন ওরা হয়ত কাঁদবে। কাঁদেনি। আসন্ন বিচ্ছেদের তাৎপর্য ওরা বুঝতে পারেনি। দোষ নেই ওদের। স্বার্থপরতায় ভরা কেনা মাটির ওপর দুটো বিচ্ছিন্ন লতার মত ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাণের যোগ ছিল না কোথাও।

ছিল না কি? ভাবতে গেলেই মহাদেও খেতনের মনে একটা সুর বেজে ওঠে। ওরা চম্পাবাঈর মেয়ে। আর চম্পাবাঈকে ভালবাসতেন মহাদেও খেতন। এখনও সে তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মনের শিরা-উপশিরায়, পারিপার্শ্বিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে জড়িয়ে আছে। প্রতি

মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়, সে আছে। শ্যামাবাঈর স্পর্শেও চম্পাবাঈর প্রেমাবেগ। সেই চম্পাবাঈর মেয়ে মায়া-কল্পনা। দেহমন আত্মার পরিপূর্ণ মিলনের দুটো স্মৃতিচিহ্ন।

—তোমাদের মন কেমন করবে না ত' ?

মায়া উত্তর দেয়নি।

কল্পনা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিস্ময় কাটিয়ে বলেছিল :

—কার জন্যে আবার মন কেমন করবে ?

মায়া বললে :

—তুমি ত' কলকাতায় যাচ্ছ ? বড় মাকে লিখে দিও, আমাদের ঘরে যেন কেউ না ঢোকে—জিনিস-পত্তর ভেঙে দেবে।

হঠাৎ মহাদেও খেতনের চোখ দুটো সজল হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদের মায়ায় নয়। অন্য একটা অনুভূতি। মেয়ে দুটোর শেকড় পচে গেছে। ওদের মন কেমন করে না। ওরা ভালবাসে না। কেনা মাটির মোহ ওদের ভেতরকার রস নিংড়ে দিন দিন বেড়ে চলেছে। রঙীন দুটো প্রজাপতি—নিজেদের ঘিরে স্বার্থের গুটি বাঁধতে শিখেছে।

সেখানে আর দাঁড়ালেন না মহাদেও খেতন। তাড়াতাড়ি চলে এলেন। আসবার সময় দুটো বাজার চলতি উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে এলেন।

—সাবধানে থাকবে। দরকার হলেই মুণিমজীকে চিঠি দিও।

—টিকিট আছে আপনার ?

চমকে উঠলেন মহাদেও খেতন। অনেকক্ষণ হ'ল ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফরমের ওপর পায়চারী করছেন। ফুফাজীর লোক এখনও আসেনি। তাঁরই আসা উচিত ছিল গাড়ী নিয়ে। গাড়ীও আসেনি।

—এই নিন।

পকেট থেকে টিকিট বের করে মহাদেও খেতন এগিয়ে দিলেন। প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেখে চেকার ভদ্রলোক লজ্জিত হলেন একটু। সন্দেহ করেই টিকিট চেয়েছিলেন তিনি।

টিকিট দেখে মহাদেও খেতনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন :

—দেখছি আপনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন—কারও আসবার কথা আছে?

বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী কথা বলার অভ্যাস মহাদেও খেতনের কোনদিনই নেই। এসব বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতেও ইচ্ছে হয় না।

লোকটিকে বিদায় করবার জন্তে মহাদেও খেতন বললেন:

—হুঁ।

লোকটিরও যেন জাল বোনবার ইচ্ছে হয়েছে। কথা বাড়াচ্ছেন কেবলই।

—আসেননি বুঝি?

—না।

—কোন্‌দিকে যাবেন আপনি?

এবার মহাদেও খেতেন ভ্রূকুটি ভরা দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের মানচিত্রে বিরক্তির আভাষ পেয়ে চেকার সংশোধন করে নিলেন।

—যদি কিছু মনে না করেন—

—কটন স্ট্রীট।

খুব শান্ত কণ্ঠে মহাদেও খেতন উত্তর দিলেন।

—তা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? ট্যাক্‌সি নিয়ে চলে যান না—? নতুন এসেছেন বুঝি কলকাতায়? বাড়ীর নম্বর মনে আছে ত? বহরমপুর থেকে এসে আমারও খুব ভয় হত। কিন্তু এখন দেখছি কলকাতায় না হারানর চেয়ে হারানটাই শক্ত। রাস্তার নাম আর বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে একটা পাঁচ বছরের ছেলে পর্যন্ত—

কথার মাঝেই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মহাদেও খেতন:

—ইতিপূর্বে আমি কলকাতায় এসেছি; আর যে বাড়ীতে আমায় যেতে হবে সেটা চিনি। আপনাকে ধন্তবাদ।

—না, না, ধন্তবাদের কি আছে?

—কুলি।

মালপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে মহাদেও খেতন স্টেশনের বাইরে চলে এলেন।

—রিক্সা পার বাবু?

কাঁটাভরা চাবুকের মত দৃষ্টি নিয়ে মহাদেও খেতন কুলিটির দিকে তাকালেন। লোকটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ইসারায় ট্যাক্সি ডাকলেন মহাদেও খেতন।

ট্যাক্সিতে বসে মহাদেও খেতনের মনটা বিষিয়ে উঠল। গাড়ী-খানার ভাঁজে-ভাঁজে যেন হাজার হাজার অস্পৃশ্যের নিঃশ্বাস মিশে আছে। হাওয়ার বেগে সেই দূষিত নিঃশ্বাস তাঁর দেহে প্রবেশ করে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।

গাড়ীর বেগ নেই। সংখ্যাতীত ট্রাম-বাস-গাড়ী আর পথচারীদের পায়ে-পায়ে জড়িয়ে ট্যাক্সিটার চাকাগুলো ঘুরছে। কেমন একটা দৈন্য মাথা হ্যাংলা-হ্যাংলা ভাব।

মাথা গরম হয়ে উঠল। বাঁ হাতের পাতায় রগের দু-পাশটা চেপে ধরে গাড়ীর এক কোণে মহাদেও খেতন হেলে পড়লেন। গাড়ী গড়িয়ে চলেছে। সময় গড়িয়ে চলেছে আরও আগে আগে।

ফুফাজী শোভারাম নেওটিয়া খুশি হননি। চিঠি তিনি সূর্যাপ্রসাদকে বহুবার লিখেছেন কিন্তু একটারও উত্তর দেননি সূর্যাপ্রসাদ। মাঝে-মাঝে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন শুধু। সে আদেশ শোভারামজী সাধ্যমত পালন করছেন। ভেবেছিলেন শেষ বয়সের দিনগুলো এই ভাবেই কাটিয়ে যাবেন।

ছুটির দরখাস্ত করেছেন বহুবার। কিন্তু সত্যিই ছুটি তিনি চাননি। বয়স তাঁর জীবনের ভিত্তিমূলে নাড়া দিচ্ছে অবশ্যই, কিন্তু পার্থিব মোহ কাটাবার অবসর তাঁর এখনও আসেনি। সাতটি ছেলের সাতটিই খোকা হয়ে আছে। মানুষ হয়নি। অবশ্য কৃতঘ্ন নয় কেউ। কৃতজ্ঞও নয়। তারা স্বীকার করে, পাহাড়ের আড়ালে আছে। পাহাড়টা যে এই কলকাতার কটন স্ট্রীটে নয়, ভাগলপুরে একথা বুঝেও বোঝে না। যে কোন মুহূর্তে এই পাহাড় সরে যেতে পারে, তখন মরুভূমির হিমশীতল বাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে।

শোভারাম নেওটিয়া সব বোঝেন, কিন্তু ছেলেদের কাছে বলতে পারেন না। প্রয়োজনের তাগিদে চুরি করতে আরম্ভ করেছেন তিনি, কিন্তু স্বীকার করবার মত সাহস আজও তিনি অর্জন করতে পারেন নি। কোন দিনই পারবেন না। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী—এদের মুখের দিকে তাকালেই তাঁর বুকের মধ্যে কান্না গুমরে ওঠে! বার্ধক্য জীর্ণ দেহটিতে একটা কম্পন অনুভব করেন। কতদিন হয়েছে—বলতে গিয়েও বলতে পারেন নি।

হাতের কাজ থামিয়ে নন্দকিশোরের মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়েছে :

—কি বলছ?

তারপরই এক গেলাস গরম জলে পাতি লেবুর রস গেলে হাতের কাছে এনে দিয়েছে। পঞ্চাশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর স্বামীর মুখ থেকে আদেশ শুনে তবে প্রতিপালন করবেন—মরণ আর কি! শোভারামজী কিছু বলার আগেই সবকিছু বুঝে যায় নন্দকিশোরের মা।

লেবুর জলের গেলাস হাতে নিয়ে আর কিছু বলতে পারেননি শোভারামজী।

নন্দকিশোরের মা বলেছে :

—আর কিছু বলছ?

—না। আর কি!

—গায়ের চাপাটা একটু ঠিক করে নাও বাপু, তোমার বয়স যত বাড়ছে ঠাণ্ডা লাগাবার শখও তত বাড়ছে।

নিজেই চাদর দিয়ে স্বামীকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে দিয়ে অন্য কাজের দিকে হাত বাড়ায় নন্দকিশোরের মা।

খুবই নিস্পৃহ অভ্যর্থনা জানালেন কুকাজী। প্রথম থেকেই মহাদেও খেতনের মনটা তিক্ত হয়েছিল, এরপর আর সহ্য হল না।

শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে মহাদেও খেতন প্রশ্ন করলেন :

—আমি ত' আসবার আগেই খবর দিয়েছিলুম। দার্জিলিং থেকে তারও করেছি।

একটা ছোট্ট প্রণামের প্রত্যাশা শোভারামজী করেছিলেন, সেটুকু না পেয়ে তাঁর অপরাধ-প্রবণ মনও গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষেপে উত্তর দিলেন :

—জয়গোপাল! এস? খবর পেয়েছিলাম।

—গাড়ীটা অন্ততঃ পাঠাতে পারতেন।

শোভারামজী সে কথার উত্তর দিলেন না। বলবার কিছু ছিলও না তাঁর। দামী গাড়ীখানা কিছুদিন আগেই তিনি নগদ্ টাকায় পরিণত করেছেন। সে টাকা শেষও হয়ে গেছে।

—কোথায় উঠেছ?

বিস্মিত হলেন মহাদেও খেতন। কটন স্ট্রীটে এত বড় নিজস্ব বাড়ী থাকতে উঠবেন কোথায়? অবশ্য দু'চারখানা ঘরে শোভারামজীর পরিবার পক্ষ বিস্তার করেছে, কিন্তু বাকী ঘরগুলো ত' ডানা-গোটান ঘুমন্ত পাখীর মত নিঃসাড়ে থাকবার কথা।

—কেন এখানেই?

—এখানে?

কিছুক্ষণ নীরবে কি ভেবে নিলেন শোভারামজী। নিজের সুবৃহৎ সংসারটিকে মাত্র তিনখানা ঘরে আঁটিয়ে নিয়ে বাকী বাড়ীখানায় ত' তিনি ভাড়াটেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন। সহস্রাধিক টাকা ভাড়া আসছে।

—আচ্ছা বেশ, তোমায় একখানা ঘরের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

বার্ধক্য-শিথিল দেহ নিয়ে শোভারামজী উঠে দাঁড়ালেন।

মহাদেও খেতন বাধা দিয়ে বললেন :

—আপনি বসুন একটু। আচ্ছা ব্যাপার কি বলুন ত'; আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!

শোভারামজী বসে পড়লেন। লোলচর্ম ঢাকা তাঁর দেহের কয়েকটা হাড় মট্-মট্ করে উঠল। একটু গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করলেন তিনি।

—এত ব্যস্ত হয়ো না, বাবা, আস্তে-আস্তে সব বুঝবে।

ঘরে ঢুকল ফুফুজী—নন্দকিশোরের মা। সমস্ত শরীরটা মেদে ঝলমল করছে। আনন্দের আতিশয্যে চোখদুটো মেদভারগ্রস্ত চামড়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। খবর পেয়েছে, মহাদেও এসেছে। পিতৃকুলের একমাত্র বংশধর!

—কোথায় মহাদেও !

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহাদেও খেতনকে দেখে। ভেবেছিল বুঝি সেই আট-ন' বছরের ছোট্ট ছেলেটা দাদাজীর সঙ্গে এসেছে। সামনে একজন সমর্থ যুবককে দেখে কুঁকড়ে এক কোণে সরে গেল নন্দকিশোরের মা।

মহাদেও খেতন এগিয়ে এসে ফুফুজীকে প্রণাম করলেন। দু'একটা টুকি-টাকি কথার পর অনর্গল কথা বলে চলল নন্দকিশোরের মা।

—একটা খবর দিয়ে আসতে হয় ত'। তাই বা আসবি কেন, নিজের ফুফুর কাছে কি কেউ খবর দিয়ে আসে? তবু একটু আগে জানলে তোর জন্যে একখানা ঘর খালি করে রাখতুম। তোরই ত বাড়ী, না হয় একটু কষ্ট করে থাকলি? কি করবি বল্, বাড়ী ভর্তি ভাড়াটে বসিয়েছেন তোর ফুফুজী। আমি বলি, বিদেয় কর সব—কিন্তু কে কার কথা শোনে?

স্বামীর দিকে ফিরল নন্দকিশোরের মা:

—আমাদের বাড়ীর ছেলেদের কিছু বলতে হয় না। ক্রোড়পতি ঘর—কিন্তু যেখানে যেমন সেখানে তেমনি করে মানিয়ে নেয়।

আবার বললে মহাদেও খেতনকে:

—চল বাবা চল, মুখ হাত ধুয়ে নেবে? সারারাত—

—'সারারাত' এখন থাক ফুফুজী—আমি এখুনি যাব।

—কোথায়?

—হোটেলে।

সেও পরের বাড়ী—হাজার লোকের গন্ধ সেখানে।

কিন্তু নিজের বাড়ীতে উদ্বাস্তুর মত মাথা গোঁজার চেয়ে সে অনেক ভাল।

নিজের মনের ভেতরটার দিকে তাকিয়ে মহাদেও খেতন বিস্মিত হলেন একটু। হোটেলের কথা চিন্তায় এল—যাবেন বলে স্থিরও করে ফেললেন। একটুও বিকার জাগল না ত'। মহানগরীর উদারতা মনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে তাহলে!

কটন্ স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে আবার ট্যাক্সিতে উঠলেন মহাদেও

খেতন। কোন বড় হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে চোখ দুটি বন্ধ করে গভীর নিঃশ্বাস টানলেন একটা।

চিঠির উত্তর খুব সংক্ষেপেই দিলেন সূর্যাপ্রসাদ। লিখেছেন—আইনের আশ্রয় নিতে পার। আমার আপত্তি নেই। দারিদ্র্যের অজুহাতে প্রবঞ্চনা করবে, সেটা আমার সহ্য হয় না। মামলা যদি জিততে পার তাহলে সময়মত জানিও—আমার অংশের যদি কিছু বেঁচে থাকে দুর্গারাণীকে লিখে দেব। ও খেতন বংশেরই মেয়ে।

আর একখানা চিঠি মুণিমজীকে লিখেছিলেন মহাদেও খেতন—নানাজী,

জয়গোপাল। গাছ কাটলেই কাঠ—মনে আছে ত'? যথাশীঘ্র ব্যবস্থা করে পাঠাবেন। মামলা-মোকর্দমায় খরচও আছে—

মুণিমজী গাছ কাটতে আরম্ভ করেই দিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞ হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, মহাদেও খেতনের ভেতর তার পিতৃরক্ত চঞ্চল হয়েছে। পত্রপাঠ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। লিখলেন, কিছু কিছু অর্থের ব্যবস্থা সব সময়ই তিনি করে রাখবেন। খবর পেলেই পাঠাবেন।

হাতে অর্থ আর মনে প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে মহাদেও খেতন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মনে মনে সংকল্প করেছেন সবংশে নিধন করবেন শোভারামজীকে। মাথা গরম হয়ে আছে সব সময়। নিজের গায়ে হাত দিয়ে মহাদেও খেতন অনুভব করেন বৈশাখী রাস্তার গলা পিচের মত দেহের রক্ত গরম হয়ে আছে। ফুটছে!

যথা সময়ে রায় এণ্ড রায়ের এটর্নী অফিসে পৌছলেন মহাদেও খেতন। দিন কয়েক পূর্বেই মোকর্দমা বুঝিয়ে দিয়ে এসেছেন। আজ খবর নিতে এসেছেন কোন্ কৌসুলীকে নিযুক্ত করা হল।

আমার কেসটা কাকে দিয়েছেন?

রায় বললেন: এখনও কারও কাছে পাঠাইনি। আপনার কাগজ-পত্র আমি ভাল করে দেখে রেখেছি। কেস ভালই। দু'জন ব্যারিস্টারের

কথা মনে হচ্ছে। সিনিয়ারে সুধীর বোস্—জুনিয়ারে সুনীল সেন। আপনার আপত্তি নেই ত ?

—আপত্তি ? না, আমি এঁদের কাউকেই চিনি না। আপনারা যদি উপযুক্ত মনে করেন, আমার আপত্তি কিছু নেই।

—সুধীর বোসকে কলকাতায় সকলেই চেনে, আর সুনীল সেন ঠিক জুনিয়র ন'ন—তার চেয়ে কিছু ওপরেই। বেশ পিক্ আপ করেছেন ভদ্রলোক। কাজকর্মও ভাল।

—আপনার ফার্মের ন'ম শুনে এসেছি, এখন আপনি যেখানে খুশি আমায় পাঠান। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি সব কাজ হওয়া চাই।

এটর্নী হাসলেন। রিভলভিং চেয়ারে একবার তিনশো ষাট ডিগ্রী পাক খেয়ে নিয়ে বললেন :

—সব ঠিকে নিতে পারি, শুধু ঐটুকু বাদ দিয়ে। সি. পি. সি. অনেক মোটা। তাতে এত রকম সমর সজ্জা দেওয়া আছে যে সত্যিকারের লড়ায়ে লোকের অস্ত্রের অভাব কোনদিন হয় না। যত দিন খুশি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।

তারপর রায় একটু দম নিয়ে প্রশ্ন করলেন :

—আপনার প্রতিপক্ষের আর্থিক বল কি রকম ?

—ঠিক জানিনা—তবে মনে হয়, তেমন ভাল নয়।

—তবে ভাববেন না—

নিজে আশ্বস্ত হয়ে রায় আশ্বাস দিলেন :

—দেওয়ানী মামলা বড় লোকদের স্পোর্টস্—যেখানে ট্যাকের জোর নেই, আইন সেখানে অসহায়—হেল্পলেস।

গল্পে সময়ের বেশ অপব্যয় হচ্ছে। কাজ আছে হাতে। রায় বললেন :

—আপনি সুনীল সেনের সঙ্গে আলাপ করুন—বেশ লোক।

ঠিকানা নিয়ে চলে আসছেন মহাদেও খেতন, রায় ডাকলেন : —শুনুন।

ঘুরে দাঁড়ালেন মহাদেও খেতন।

—আপনি ত' কলকাতায় থাকেন না- বাংলা দেশেই মানুষ হয়েছেন বুঝি ?

—না, বিহারে।

—চমৎকার বাংলা বলেন ত'! আর হাবভাবে বোঝবার উপায় নেই, আপনি বাঙালী নন?

মহাদেও খেতন হাসলেন। বলতে ইচ্ছে হল, এসব আমার বাবার খেয়াল। তাঁর সংস্পর্শে না হলেও রুচিতেই আমি শিক্ষিত। জীবনে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি কম, কিন্তু বাঙলা, বিহার, গুজরাট—যে কোন জায়গায় আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক না কেন; তোড়ার মাঝে গোলপটি হয়ে ঠিক বসে যাব। মানিয়ে নেব নিজেকে।

ইচ্ছে হলেও বললেন না কিছু। মানিয়ে তিনি ঠিকই নেবেন। কিন্তু তা ওপর-ওপর, বাইরের জগতের সঙ্গে। ভেতরের দুনিয়ায় তিনি একক।

ব্যারিস্টার সুনীল সেন।

নতুন রাস্তার ওপর পাশাপাশি প্রায় একই কাঠামোয় গড়া খান তিন-চার বাড়ী। নামের ট্যাবলেট দেখে বাড়ী খুঁজে নেওয়ার কষ্ট হয় না।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফটক পেরিয়ে মহাদেও খেতন ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ী ঢুকলেন। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মরসুমী ফুলের গাছ আছে দু'চারটে। দু'পাশে দুটো পাম গাছও দেখতে পেলেন মহাদেও খেতন। মনে মনে একটু হাসলেন। বাগান! সীমাহীন বৃক্ষাদিপূর্ণ প্রান্তরকেই এতদিন পর্যন্ত বাগান বলে জেনে এসেছেন, তুলনায় এটিকে মনে হল বৈঠকখানার মধ্যে টবে পোঁতা দু-একটি গুল্মলতা; যেগুলো রোদে ঝরে যায় আর ছায়ায় বাড়ে। তবু ভালই লাগল। ছোট্টর মধ্যে সাজান পরিবেশটায় সুরুচির স্পর্শ আছে। ভাল লাগল না একটা জিনিস—বাইরের বারান্দার ইলেক্‌ট্রিকের আলো বাগানের বুক জুড়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনার প্রয়াসটা তাই নষ্ট হয়ে গেছে অনেকখানি। বিজলী বাতির ভয়ে চাঁদের আলো ওপর আকাশেই মিলিয়ে আছে, এতদূর পর্যন্ত পৌঁছুতে সাহস করেনি।

ফটক থেকে দু-চার পা এগিয়ে বারান্দায় উঠলেন মহাদেও খেতন। বাঁ দিকে ছোট্ট একটা ঘর। খোলা। কয়েকটা আলমারী আর ছোট একটা টেবিল নজরে পড়ল। বই আর নথীপত্রে সমাকীর্ণ সেগুলো।

এই ঘরেই প্রথমে ঢুকলেন মহাদেও খেতন। কেউ নেই ভেতরে। বেরিয়ে এসে আবার বারান্দায় দাঁড়ালেন।

—কাকে চাই ?

বাগানে দাঁড়িয়ে যে লোকটি ধূমপান করছিল, বিড়ি ফেলে বারান্দার ওপর উঠে এল।

—ব্যারিস্টার সাহেবকে।

—বসুন। কার্ড—

—নেই।

বারান্দার ওপর বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে লোকটি চলে গেল। মহাদেও খেতন বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন।

ডানদিকের ঘরের দরজা খুলে লোকটি মিনিট খানেকের মধ্যেই বেরিয়ে এল :

—আসুন সাহেব ডাকছেন অফিসে।

সামনে দাঁড়িয়ে মহাদেও খেতন ছোট্ট একটি নমস্কার জানালেন। প্রতিনমস্কারের ভঙ্গিতে সামান্য একটু ঘাড় হেলিয়ে সেন সাহেব বসতে বললেন।

মহাদেও খেতন বসলেন। সেন সাহেব স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আভিজাত্যপূর্ণ সুগৌর দীর্ঘকায় মানুষ। বাঙালী কিনা বোঝা কঠিন। সেই অবসরে মহাদেও খেতন দেখে নিলেন সেন সাহেবকে। সম্ভবতঃ তাঁরই সমবয়সী। কেশ বিরল মাথায় বেশ একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রশান্তির ছায়াপাত হয়েছে। বয়সের আগেই ব্যারিস্টার সাহেব শ্রদ্ধা সম্মান কুড়োবার শক্তি অর্জন করেছেন বলেই বোধ হয় যেন।

—বলুন ?

—আমার মোকর্দমার জন্যে এসেছি। রায় এণ্ড রায় থেকে আমার ব্রিফ আপনার কাছে পাঠিয়েছে ?

সেন সাহেব একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন :

—আপনার নিজের কেস ? কি নাম বলুন ত' আপনার ?

—মহাদেও খেতন।

—ঠিক বলতে পারছি না—দাঁড়ান দেখছি।

কলিং বেলে একবার চাপ দিলেন সেন সাহেব। ভৃত্যাটি ঢুকতে বললেন তাকে :

—বাবুকে ডাকত রামেশ্বর ?

মহাদেও খেতন কৌতূহলী হলেন একটু :

—বাবু !

—হাঁ, আমার ক্লার্ক।

মহাদেও খেতন বললেন :

—ও পাশের ঘরটা বোধহয় তাঁর দপ্তর ? তিনি নেই ওখানে।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে রামেশ্বর জবাব দিলে :

—এখুনি এসে পড়বেন, মেম সাহেবের সঙ্গে মার্কেটে গেছেন।

—তাহলে আপনাকে একটু বসতে হবে। আচ্ছা এক কাজ করত রামেশ্বর, বাবুর টেবিলের ওপর থেকে ব্রিফের লিস্টটা নিয়ে আয়। চিনতে পারবি ?

—না হুজুর ! বাবুর টেবিলে হাত দিলে বড় চটে যান, বলেন—

—আচ্ছা তুই যা, বাবু এলে পাঠিয়ে দিবি।

আগামীকাল রবিবার ছুটি। সামনের লোকটিও সেন সাহেবকে একটু আকৃষ্ট করেছে।

সেন সাহেব প্রশ্ন করলেন :

—বাড়ী কোথায় আপনার ?

—বাড়ী, মানে কোথায় থাকি ? ভাগলপুর—

সেন সাহেব হাসলেন :

—ওখান থেকে এখানে এসে মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন ! কি কেস আপনার ?

সংক্ষিপ্ত করে বলতে গিয়ে দীর্ঘতর গল্প ফাঁদলেন মহাদেও খেতন। তাতে তাঁর কেস সম্পর্কে সেন সাহেব কোন স্পষ্ট ধারণা পেলেন না, তবে লোকটিকে চিনতে পারলেন যেন। মনে মনে বললেন, বিচিত্র লোক।

খুব মন দিয়ে সেন সাহেব সব কথা শুনেছেন। মহাদেও খেতন খুশি

হলেন। তারপর ঘড়ি দেখলেন একবার। প্রায় ন'টা বাজে। সেন সাহেব একটু উস্‌খুস্‌ করছেন যেন। ঘণ্টা বাজিয়ে রামেশ্বরকে ডাকলেন একবার।

—এখন পর্যন্ত ফেরেনি!

—ফিরলে কি জানতে পারতেন না?

উত্তরের ভঙ্গি শুনে মহাদেও খেতন বিস্ফারিত চোখে একবার রামেশ্বর আর একবার সেন সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। রামেশ্বরের গম্ভীর মুখ।

মহাদেও খেতনের দৃষ্টির তাৎপর্য অনুমান করে সেন সাহেব বললেন:

—আমার পৈত্রিক সম্পত্তি—পুরাতন ভৃত্য।

মহাদেও খেতন হাসলেন।

—আমি তাহলে কাল একবার আসব কি?

—কাল? না কাল রবিবার। আপনি বরং পরশু আসুন। রাত আটটা নাগাৎ আসবেন। বেশ লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে!

মহাদেও খেতন উঠে দাঁড়ালেন:

—যদি এখনও আমার ব্রিফ না এসে থাকে, সোমবারের মধ্যে নিশ্চয়ই এসে যাবে, কি বলেন?

—ব্রিফ তৈরী করতে দু'একদিন দেরীও হতে পারে, তবে তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না—রায় এণ্ড রায় খুব রিলায়েবল ফার্ম।

এরপর সেন সাহেব হেসে উঠলেন:

—মোকর্দমার নেশায় পেয়েছে আপনাকে?

—নেশা নয়—

মহাদেও খেতন মুখটা গাম্ভীর্যে ভারী করে বললেন:

—তবে রক্ত আমার সব সময় ফুটছে।

এ-কথার উত্তর না দিয়ে সেন সাহেব স্মিতমুখে মহাদেও খেতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পকেট থেকে একমুঠো নোট বের করে মহাদেও খেতন টেবিলের ওপর রাখলেন।

সেন সাহেব যেন একটু বিস্মিত হলেন:

—ওটা কি!

আপনার কনসালটেশন্ ফিজ্। এক ঘণ্টা ধরে আমার কেশ শুনলেন।

—ওঃ—হাসলেন সেন সাহেব।

—আমরা এটর্নীর থ্রু দিয়ে টাকা নি'। ডাইরেক্ট নি' না। তাছাড়া আপনার কেস্ আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

অবাক বিস্ময়ে মহাদেও খেতন বসে পড়ে বললেন :

—এক ঘণ্টা ধরে বললাম, আর কিছ্ছু বোঝেননি ?

আবার হাসলেন সেন সাহেব :

—না।

মহাদেও খেতন চুপ করে বসে রইলেন। মাথা গরম হয়ে উঠল। খুব ব্যারিস্টার দিয়েছে রায় এণ্ড রায়। এটিকে বদলাতে হবে। স্থির করলেন বোস সাহেবটিকেও আগামীকাল বাজিয়ে আসতে হবে।

—আচ্ছা আজ যাই ? নমস্কার।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই মহাদেও খেতন যেতে উদ্যত হলেন।

সেন সাহেব একটু দৃঢ়স্বরে বললেন :

আপনার টাকা নিয়ে যান।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহাদেও খেতন। টেবিলের দিকে হাত কিছুতেই এগোতে চাইল না। টাকা দিয়ে ফেরৎ নিতে কোথায় যেন বাধছে। কোনদিন করেননি এমন কাজ। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে হঠাৎ তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিস্ময়াভিভূত সেন সাহেব বসে রইলেন চুপ করে। সবেগে বেরিয়ে গেছেন মহাদেও খেতন। তাঁর গায়ের ধাক্কায় দুলে-ওঠা দরজার পর্দা এখনও কাঁপছে থরথর করে !

বোস সাহেব সময় দিতে পারলেন না। সংক্ষেপে বললেন :

—আপনার ঠিকানা রেখে যান, দরকার বুঝলে টেলিফোনে খবর দেব, আর আমার সঙ্গে সুনীল সেন আছে ত'—তার সঙ্গে টাচ্ রাখলেই চলবে। আচ্ছা তবে—।

অন্য মক্কেলের দিকে মন দিলেন বোস সাহেব। নমস্কার জানিয়ে মহাদেও খেতন নীরবে উঠে এলেন।

বোস সাহেব সম্বন্ধে তখনও মনস্থির করতে পারেননি মহাদেও খেতন। বাজিয়ে দেখে নেওয়ার অবসরটুকু দেননি তিনি। কিন্তু সুনীল সেন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা তখন গড়ে উঠেছে। এক ঘণ্টার আলাপে কিছুই বুঝতে পারেনি লোকটা। নামেই ব্যারিস্টার। ভারতের নাম করা অনেক ব্যারিস্টারের নাম মহাদেও খেতন শুনেছেন। তাঁরা নিজেদের চেম্বার থেকে এজলাস পর্যন্ত যেতে যেতে জুনিয়রের মুখ থেকে সার তথ্য আহরণ করে তৈরী হয়ে যান। সেই এক মিনিটের সম্বলটুকুর জোরে সওয়াল করেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। মাস কাটিয়ে দেন এক একটি পদের বিশ্লেষণে।

আবার এটর্নী অফিসে এলেন মহাদেও খেতন। মামলা আদালতে না ওঠা পর্যন্ত তিনি সুস্থির হতে পারছেন না। শোভারামজীর বিশ্বাসঘাতকতা খুবই আহত করেছে তাঁকে। এতদিনকার বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। একবারও যদি শোভারামজী নিজের অভাব অভিযোগের কথা জানাতেন তাহলে এককথায় তিনি কলকাতার গদী ও বাড়ীর অংশ শোভারামজীর নামে লিখে দিতেন। সূর্যাপ্রসাদও দিতেন। কারণ নন্দকিশোরের মা খেতন বংশের মেয়ে। এখন যে কোন বংশেরই বধূ হোক না কেন, তবু খেতন বংশের মেয়ে। তার দারিদ্র তার পিতৃ-বংশের কলঙ্ক। নিমেষে সে দারিদ্র ঘুচিয়ে দিতেন মহাদেও খেতন। নিজের সর্বস্ব দিয়েও দিতেন। কিন্তু চোরের সহধর্মিণীরূপে তিনি ফুফুজীকে স্বীকার করবেন না। ধূলোয় মিশিয়ে দেবেন নেওটিয়াদের।

মহাদেও খেতনের মুখে সমস্ত ঘটনাটি শুনে এটর্নী রায় একবার কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসলেন। বুঝলেন আইন আদালত সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই লোকটির নেই। এমন কি কোনদিন একলা রাস্তায় চলেছেন কিনা সে বিষয়েও তাঁর মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল। দুঃখও হল একটু। কলকাতার আবহাওয়ায় এসব লোকগুলো সাবানের মত নিঃশব্দে গলে যায়।

বেশ আন্তরিকতার সুরে রায় বললেন :

—দেখুন, এ সব পারিবারিক বিবাদ ঘরে বসেই মিটিয়ে নেওয়া যায় না কি ?

—সম্ভব নয়।

—তবে যা সম্ভব তাই করুন।

নিজের পেশা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রায় বললেন :

—দেখুন আপনার ইচ্ছে না থাকলে আমি সুনীল সেনের কাছ থেকে ব্রিফ ফিরিয়ে নিতে পারি—পরশুই তাঁকে পাঠিয়েছি। তবে আমার কি মনে হয় জানেন, কাগজ-পত্র না দেখে যে ব্যারিস্টার মামলা বুঝে ফেলেন তাঁর সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া ভাল।

—কিন্তু উনি যে কিছুই বোঝেন না !

মিঃ রায় হাসলেন। বয়সের অধিকারে অর্জিত স্নেহের ভার মহাদেও খেতনের ওপর চাপিয়ে বললেন :

—যা বলছি বিশ্বাস করুন। যথা সময় দেখবেন উনি সবই বোঝেন—আমি আপনাকে ঠকাব না।

রবিবারের অবসরে মহাদেও খেতনের কথা সেন সাহেব ইরাকে বলে রেখেছিলেন। ইরা শুনেছিল, কিন্তু তেমন আগ্রহ নিয়ে শোনেনি।

শেষে বললে :

—তুমি কোর্টে বেরুচ্ছ আজ প্রায় বছর আটেক হ'ল। প্রথম-প্রথম মক্কেলদের কথা শোনাতে—তারপর ত' আর শোনাও নি কোন দিন ? আবার আরম্ভ করলে, হাতে কাজ-কর্ম নেই বুঝি ?

ইরার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের কেশ-বিরল মাথায় বার কয়েক বুলিয়ে সেন সাহেব উত্তর দিলেন :

—তা নয়। তবে লোকটি একটু বিচিত্র-প্রকৃতির মনে হল। কাল সন্ধ্যের পর আসতে বলেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব !

ইরা হাসলে। তারপর কৌতুকের ভঙ্গীতে চোখ দুটো নাচিয়ে বললে :

—কি ব্যাপার বল ত' ! শুনেছি অনেক ছোট অফিসার উন্নতির লোভে বড় অফিসারের সঙ্গে স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেয়। তোমাদের স্বাধীন ব্যবসায় ও সব চলছে নাকি ?

ইরার কৌতুকের তীরটা নিজের দিক থেকে সেন সাহেব তারই দিকে ফিরিয়ে দিলেন :

—আমি ত' শুধু মৌখিক আলাপের কথাই বললুম—আর তুমি দেখছি বেশ কয়েক ধাপ আগিয়ে ভেবে বসে রইলে !

স্বামীর হাত থেকে ধূমায়িত পাইপটা কেড়ে নিয়ে সেটা ত্রি-পায়ার ওপর ফেলে দিয়ে ইরা বললে :

—বুঝতে পারছি তোমার প্রাকটিসের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে ! যে উকিল-ব্যারিস্টার স্ত্রীর সঙ্গে কথার প্যাঁচ খেলে তার বাইরে মুখ খোলে না।

—তাই নাকি !

—জান না ?

—না। পুরুষ যেদিন সব জানতে পারবে, সেদিন মেয়েদের কাছে তার দাম ফুরিয়ে যাবে।

—কেন ?

—আমাদের বোকামিটাই ত' তোমাদের মূলধন—ওটুকু যেদিন ঘুচবে সেদিন বাজারে তোমরা ডি-ভ্যালুয়েটেড্।

ত্রি-পায়ার ওপর থেকে পাইপটা তুলে নিয়ে মুখে লাগিয়ে সুনীল সেন হাসতে লাগলেন।

কৃত্রিম রোষান্বিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে ইরা বললে :

—মেয়েদের মূল্যায়ণের চেষ্টা না করে দু-চারটে লিডিং কেস মুখস্ত কর ত', কাজ দেখবে।

ঠিক ঘড়ি ধরেই মহাদেও খেতন এলেন।

তাঁরই জন্ম সেন সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। খুশি হয়ে বললেন :

—আসুন।

কি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলেন মহাদেও খেতন। সেটিকে নিজের কথার তলায় চাপা দিয়ে সেন সাহেব সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন।

—আপনার ব্রিফ এসে গেছে। শনিবারই এসেছিল। কাল দেখে রেখেছি ; কিছু-কিছু বুঝতে পেরেছি বলে মনে হয়—শুনুন ত' মন দিয়ে।

পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে মহাদেও খেতন সেন সাহেবের সব কথা

শুনলেন। তাঁর মোকদ্দমার একটা সুস্পষ্ট ছক সেন সাহেব নিজের মনের মধ্যে এঁকে রেখেছেন। খুশি হলেন মহাদেও খেতন্। তাঁর ধারণাতীত অনেকগুলো পয়েণ্ট সেন সাহেবের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। জটিল পয়েণ্ট—কিন্তু তা সমাধানের উপায়ও তিনি স্থির করে রেখেছেন।

মহাদেও খেতন বলে ফেললেন :

—পরশু রাতে এখান থেকে যাওয়ার সময় আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, আপনাকে আমার মোকর্দমা দেওয়া চলতে পারে না!

সেন সাহেব হাসলেন :

—আমার ঐ এক দোষ! মক্কেলের মন-রাখা কথা বলতে পারি না। যা বুঝি স্পষ্ট বলে ফেলি। যা' হোক এখন কি স্থির করলেন?

উত্তরে মহাদেও খেতন একটু সলজ্জ হাসি হেসে বললেন :

—এখন মত পরিবর্তন না হলে কি ও' কথাটা বলতাম?

কাগজ-পত্র সেন সাহেব গুটিয়ে রেখে বললেন :

—আজ এই পর্যন্ত থাক। দু'এক দিনের মধ্যেই আপনার কাজ নিয়ে উঠে-পড়ে লাগব। এখন আসুন, একটু গল্প-গুজব করা যাক। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। রামেশ্বর!

কেমন অসহায় মুখভঙ্গিতে মহাদেও খেতন তাকালেন :

-- তিনি এলে আমি কি বলব?

সেন সাহেব নিজের চেহারার ওপর থেকে গাম্ভীর্যের পর্দা সরিয়ে দিয়ে বললেন :

—আপনার মোকর্দমার গল্প বলবেন।

—তিনিও কি ব্যারিস্টার? এখানে দু'একজন মেয়ে ব্যারিস্টার আছেন শুনেছি?

—চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক্—

স্মিত মুখে সেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন :

—আমার স্ত্রী পাশ-করা ব্যারিস্টার নয়; তবে জানেন না বোধ হয়—হাইকোর্টের ব্যারিস্টার পত্নী নিজের কোর্টে প্রিভিকাউন্সিলের ব্যারিস্টারের মত সওয়াল করে।

এইবার সব বুঝে মহাদেও খেতন খোলা মনে হেসে উঠলেন।

ইরা ঘরে ঢুকতে মহাদেও খেতন উঠে দাঁড়ালেন।

—বসুন।

কথাটা বলে ইরা নিজে আসন পরিগ্রহ করলে।

সেন সাহেব পরিচয়ের সূত্রটা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেন :

—এঁর কথাই তোমাকে কাল বলছিলাম ইরা।

কৌতূহলে ডোবান স্বরে মহাদেও খেতন প্রশ্ন করেন :

—কি বলছিলেন আমার কথা ?

ঈষৎ-কুঞ্চিত চোখে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে সেন সাহেব সহাস্যে বললেন :

সে দাম্পত্যালাপের কথা শুনে আপনার লাভ নেই।

ইরা লজ্জিত হ'ল একটু :

—এঁর সব কথাই এইরকম।

—তা হোক—তা হোক—

পরিচয় ত হ'ল কিন্তু কি বলবেন মহাদেও খেতন ভেবে পান না। তার ওপর বাংলা ভাষা জানলেও বাঙালী মেয়ের মুখোমুখি তিনি এই প্রথম বসেছেন। শিক্ষিতা ব্যারিস্টার পত্নী। তরুণী। সুন্দরী। এদের মনোজগতে অভ্যস্ত স্বচ্ছন্দে বিহার করার ক্ষমতা তাঁর কোথায়! ইরার উপস্থিতি তাঁর মনের অসহায় প্রতিচ্ছবিটা যেমন তাঁরই সামনে তুলে ধরেছে। যত কথা বলবার জন্যে ভাবেন, বলার আগেই তা মনের মধ্যে বাতিল হয়ে যায়। সহজ-সরল হওয়ার চেষ্টা করেও হওয়া যায় না। তুষার-শুভ্র ললাটে মুক্তকণার মত ঘাম ফুটে ওঠে।

ইরা উঠে গিয়ে ফ্যান খুলে দিলে :

—আপনার গরম লাগছে ?

আসরটাকে জমিয়ে তোলবার জন্যে সেন সাহেব বলেন :

—আপনি চা খাবেন ত' মহাদেব বাবু ?

—চা! চা, ত' আমি কোনদিন খাইনি।

—বলেন কি!

এতক্ষণে বলবার মত একটা কথা পেয়ে ইরা যেন একটু বাঁচল :

—বিস্ময়ে একেবারে ফেটে পড়লে যে! সব লোককেই বুঝি তোমার মতো নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে হবে? চুরুট—পাইপ—চা—

বাকী কয়েকটা নেশার নাম করতে গিয়ে ইরা থেমে গেল।

সেন সাহেব হাসলেন :

—নেশা করি আমি আর উচ্চারণে লজ্জা হ'ল তোমার! আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে কি বলে জান—হাফ্ হিজ্ বডি পেরিশেস্ হুজ্ ওয়াইফ্ ইনটক্শিকেশন্, ড্রিঙ্ক—অর্থাৎ স্ত্রী যদি মদ্যপান করে স্বামীর অর্ধেক শরীর পচে যায়। এ ক্ষেত্রে উল্‌টো হল দেখছি!

চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখছিলেন মহাদেও খেতন। নেশা প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না তাঁর।

সেন সাহেবের কথা শেষ হতে তিনি ইরার দিকে তাকিয়ে বললেন :

—আপনাদের বাড়ীটা ঠিক ফ্রেমে-বাঁধা-ছবির মত সুন্দর।

ইরা সকৌতুকে বললে :

বলেন কি! সাত-আটটা ঘর—আসবাব-বাগান-মানুষ আপনার কল্পনায় সব ছোট্ট ছবির ফ্রেমে এ টে গেল!

মহাদেও খেতন হাসলেন। কৌতুকে নয়। অনুকম্পায়। অদ্ভুত লোক দুটিকে দেখছিলেন তিনি। দেখছিলেন কলকাতার মানুষ দুটিকে। কত অল্প পরিসরে এরা নিজেদের জীবনকে গুছিয়ে নেয়। খেলাঘরের মধ্যে বসে এরা অমৃতময় জীবনের আস্বাদ নেয় কি করে! কোথা থেকেই বা পায়। ক্ষুদ্র জীবন, নগণ্য জীবিকা নিয়ে অল্পপরিসর ভাড়াবাড়ীতে বাস করে ঝরাপাতার মত এই মানুষগুলো মহাজীবনের গান শোনায় কি করে?

আদালতের সমন পেয়ে শোভারাম নেওটিয়ার ভেতরটা ঝল্‌সে গেছে। তারই আঁচ তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। কৌরব রক্তের সঙ্কল্প বৈচিত্র তাঁর দেহের শিরায়-শিরায় একটি মাত্র সঙ্কল্প নাচিয়ে বেড়াচ্ছে—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব।

নন্দকিশোরের মা শুনলে। শুনে তার পঞ্চাশ বছরের আত্মবিশ্বাসটা সেই মুহূর্তেই ভেঙে গেল। বড় মুখ নিয়ে ভাবত—স্বামীর মুখের কথা দূরে

থাক, তার নিঃশ্বাস শুনে সে সব বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, স্বামীর ভেতরকার উত্থান-পতন। অস্থিরতা-প্রশান্তি। আর এত বড় ব্যাপারটা সে ঘুণাক্ষরেও জানত না!

ভেতরকার অশ্রুটাকে জোর করে গলার দু'পাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নন্দকিশোরের মা বললে:

—তুমি ত' কোনদিনই আমায় কিছু বলনি?

—কি বলব!

কেমন এক অদ্ভুত স্বরে শোভারামজী যেন আত্মজিজ্ঞাসা করেন।

সত্যিই নন্দকিশোরের মা ভাবে, কি বলবে স্বামী। কোনদিনই ত' সে তাঁকে বলবার সুযোগ দেয়নি। কোন প্রশ্ন করেনি। বড় গর্ব নিয়ে ভাবত—লোকটার বলবার কিছু থাকতে পারে না। কারণ সে স্বামীকে সব দিক দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিল। পুত্র-কন্যা, আরাম-আপ্যায়ন, কোন দিকে কোন অভাব রাখেনি। 'তোমার কি চাই' এ প্রশ্নও করেনি কোনদিন।

এই প্রথম নন্দকিশোরের মা জানতে চাইল:

—এবার কি করবে?

জানতে চেয়ে মনে হল সে যেন আজ সবদিক দিয়ে পরাজিত হয়েছে। আজ তার করবার কিছু নেই। বলবার কিছু নেই। না, নেই বা কেন! সে গিয়ে ধরবে মহাদেও খেতনকে। চিঠি লিখবে সূর্যাপ্রসাদকে। স্বামীর মুক্তি প্রার্থনা করবে।

কথাটা শুনে শোভারামজী রুদ্ররোষে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন:

—না। খবরদার! আমি লড়ব—

—কিন্তু কি লাভ?

—জানিনা। কিন্তু তোমায় আমি ভাই ভাইপোর হাতে ছোট হতে দেব না।

—কিন্তু—

ঝোঁকের মাথায় শোভারামজী উঠে দাঁড়ালেন:

—তোমায় আমি অন্ন-বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়ে খেতন-বাড়ী থেকে নিয়ে

এসেছি—এখন সেখানেই ভিক্ষে করতে পাঠাব! আমি ত' চোর হয়েই গেছি, কিন্তু বেঁচে থাকতে তোমায় ভিখিরী করতে পারব না।

আজ স্বামী প্রথম তার কথায় প্রতিবাদ করেন। তার ইচ্ছায় প্রতিরোধ দিলে। তবু নন্দকিশোরের মার মনে হচ্ছে, আহত হয়েও যেন গভীরতর মর্যাদায় সে আজ ভূষিত হল। চোর স্বামীকে নিয়েও তার গর্ব। বড়-বড় জলের ফোঁটা ফেলে নন্দকিশোরের মা কাঁদতে থাকে। সবার সামনে এমনি করে কাঁদতে পারে সে। কাঁদতে-কাঁদতে বুক ফুলে উঠবে। ফাঁপা ক্ষোভে নয়। অক্ষয় গর্বে।

উঠে-পড়ে লেগেছেন মহাদেও খেতন। একটা বিদ্বেষকে আইনের শত ফলার অস্ত্রে পরিণত করেছেন তিনি। রোজই নতুন-নতুন মোকর্দমার উদ্ভাবনা করেন। প্রতিপক্ষও কম নয়, তাতে মহাদেও খেতন আরও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। রোজই সন্ধ্যার পর সেন সাহেবের দপ্তরে তাঁর সময় নির্দিষ্ট থাকে। ঠিক সময়ে আসেন মহাদেও খেতন। ঘড়ি ধরে দেখেন—কখনও আটটার এক মিনিট এদিক-ওদিক হয় না! কলকাতার আদালতগুলোও তাঁকে চিনে ফেলেছে। পুরানো সুরার মত মোকর্দমার নতুন নেশা তাঁকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে ফেলেছে।

সেন সাহেব মাঝে মাঝে বাধা দেন:

—আমি বলি মহাদেব, এইবার সব বন্ধ কর।

—কি?

—এই মামলা-মোকর্দমা।

—তোমার কাছে আসা বন্ধ করতে পারি, কিন্তু উকিল বাড়ী বা আদালত যাওয়া ছাড়ব না। যাই হোক, আপাততঃ দয়া করে দেখ—ঐ যে কি বলছিলে মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশনের ভ্যালুয়েশন রোথ পাব্লিক ডকুমেণ্ট কিনা?

—হুঁ!

গম্ভীর হয়ে সেন সাহেব বলেন:

—ইয়া, সেকসন সেভেনটি ফোর-এভিডেনস্ একট্। দাও বইটা মহাদেবকে। পড় মহাদেব।

আলমারী থেকে বই বের করে ইরা মহাদেও খেতনের হাতে এগিয়ে দেয়। বই খুলে মহাদেও খেতন পড়তে থাকেন।

মাঝ পথে সেন সাহেব বাধা দেন:

—ওটা কোন্ অথারের—ড্যাৎ কিছু লেখেনি! দাও ইরা বেস্টের এভিডেনস্ একটু দাও।

আবার আলমারী খোলে ইরা। বেস্টের এভিডেনস্ একটু। একটা নয়? অনেকগুলো খণ্ড।

—কোন ভল্যুম দেব?

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভেবে নেন সেন সাহেব—

—ভল্যুম-ভল্যুম, থ্রি-ফোর দাও, দেখি।

আবার বই এগিয়ে দেয় ইরা। সেন সাহেবের নির্দেশ মত পাতাটি বের করে মহাদেও খেতন পড়তে থাকেন। ইরা দাঁড়িয়ে দেখে। দুটি ধ্যানমগ্ন যোদ্ধা। সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অপেক্ষা করে আবার নতুন কি ফরমাস আসে।

—হ্যালস্‌বেরিজ্ লজ অফ ইংল্যাণ্ড, ইরা।

এবার ইরা প্রতিবাদ করে:

—আর নয়। রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেছে।

—আর পাঁচ-দশ মিনিট, ইরা হ্যালস্‌বেরি থাক—মূল্লার সি. পি. সি-টা দাও। কাল যে অর্ডারটা হয়েছে, ওটা এপিলেকেবল কিনা, দেখে রাখি।

অগত্যা বইখানা ইরা মহাদেও খেতনের হাতের কাছে এগিয়ে দেয়, বলে:

—আজকের মত এই শেষ কিন্তু?

কাকে বলে ঠিক বোঝা যায় না। হয়ত সেন সাহেবকে—কিংবা দু'জনকেই বলে।

পাইপে নতুন করে অগ্নি সংযোগ করেন সেন সাহেব:

—পড় মহাদেব, অর্ডার ফরটি থ্রি।

মহাদেও খেতন দু'একটা লাইন পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে যান! পড়া বন্ধ হয়ে যায়। চম্পাবাঈর কথা অনেক দিন পরে মনে পড়ে। দুপুর বেলা মার্কারকে ছুটি দিয়ে দিতেন। দুটো দশ মিনিটে আসত চম্পাবাঈ।

মার্কারের স্থানাভিষিক্ত হয়ে পড়ত সে। বিলিয়ার্ড টেবিলের পকেট থেকে বল তুলে দিত। কখনও-কখনও ঠিক জায়গাতে বলগুলি বসিয়ে দিত। দূরের বল মারবার জন্যে রেষ্ট এগিয়ে দিত হাতের কাছে। এসব ছিল চম্পাবাঈর এক রকম খেলা। কতদিন মহাদেও খেতন তাকে খেলা শেখাবার চেষ্টা করেছেন। সাধ্য-সাধনা করেও পারেন নি। কিছুতেই রাজী হয়নি সে। তবু নিয়মিত এসেছে দুটো দশ মিনিটে।

ইরা হাতের কাছে বই এগিয়ে দিতে তিনি পড়ে চলেছেন। ইরা ইংরেজি জানে। খুবই ভাল জানে, কিন্তু পড়ে না। পড়া শোনে, যেমন খেলা দেখত চম্পাবাঈ। চম্পাবাঈ খেলত না, তবু আসত দুটো দশ মিনিটে। ইরা পড়ে না, তবু আসে রাত আটটায়।

দুটি গানের সুরে মহাদেও খেতন আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন—পড়া আর এগোয় না।

পাইপে একটা জোর টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিরক্তি-ভরা স্বরে সেন সাহেব বলেন :

—কি হল মহাদেও, ইংরেজি ভুলে গেলে নাকি ?

তন্ময়তায় ঘা পড়ে মহাদেও খেতনের। আচ্ছন্নাবস্থা থেকে হঠাৎ জেগে ওঠেন যেন। কিন্তু আর পড়তে ভাল লাগে না।

—আজ থাক, চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হয়ে গেল।

—সব ননীর পুতুল ! দাও, আমার হাতে বই দাও—

বইটা সেন সাহেব মহাদেও খেতনের হাত থেকে কেড়ে নিতে যান, তার আগে ইরাই সেখানা কেড়ে নিয়ে বলে :

—নাও, আজ এইখানেই শেষ কর—দয়া করে এবারে খেতে চল ত' ? আপনিও উঠুন মহাদেববাবু, আপনার নেমনতন্ন।

মহাদেও খেতনের মন তখন কল্প-সাগরে ডুব দিয়েছে। স্মৃতির মুক্তো কুড়িয়ে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রে মালা গাঁথছেন ! সে মালায় চম্পাবাই আছে। ইরা আছে।

বললেন :

—আমার আজ খেতে ইচ্ছে নেই।

কোনদিনই ত' থাকে না, চলুন—

খাবার টেবিলে বসে সেন সাহেব বললেন :

ড্রিঙ্ক করবে মহাদেব ?

ইরা ইসারায় সেন সাহেবকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে দিকে না তাকিয়ে সেন সাহেব আবার বললেন :

-- ড্রিঙ্ক করবে ?

—ড্রিঙ্ক !

—হাঁ, মদ।

—ও।

খাবে ? সংস্কারে বাধবে না ত' ?

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে মহাদেও খেতন বললেন :

—কোনদিন অবশ্য খাইনি ; তবে আমার দেহে পিতৃ-রক্ত আর মদিরা-স্রোত দুই-ই আছে। ও সম্বন্ধে আমার কোন সংস্কার নেই।

তারপর হাসলেন মহাদেও খেতন :

—আর পাপ যদি হয় গঙ্গাস্নান করলেই ধুয়ে যাবে। দাও, একটু খাই—কি সুখ আছে চেখে দেখে নি' ?

একটা গেলাসে খানিকটা পানীয় ঢেলে সেন সাহেব মহাদেও খেতনের দিকে এগিয়ে দিলেন :

—গঙ্গাস্নানে পাপমুক্ত হয় কিনা জানি না, কিন্তু সংস্কার বেড়ে যায়। আজকের দিনে পাপমুক্ত হওয়ার চেয়ে সংস্কার মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন অনেক বেশী।

মহাদেও খেতন গ্লাসে চুমুক দিলেন। তাঁর দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার হঠাৎ চলে যাওয়াটা দুজনকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সেন সাহেব হাসলেন :

—ওকে আমি বুঝে উঠতে পারি না। বিয়ের আগে থাকতেই জানে আমি মদ খাই, তবু আজও ওর সহ্য হয় না। মানাও করে না কোনদিন। কেমন লাগছে মহাদেব ?

আর একটা চুমুক দিয়ে মহাদেও খেতন বললেন :

—ভাল নয়। কেমন একটা গন্ধ। পেট জ্বলে যায়। গলা জ্বালা করে।

একটু একটু নেশা জাগছে সেন সাহেবের। শিথিল কণ্ঠে হেসে উঠলেন খল্‌খল্‌ করে।

—অনলেই অমৃত আছে, মহাদেব ওটুকু খেয়ে নাও।

নিঃশেষিত গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মহাদেও খেতন বললেন :

—অনলে অমৃত আছে! তবে দাও আর একটু।

ক্রমশঃ সম্পূর্ণ বোতলটাই মহাদেও খেতন শেষ করে ফেললেন।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেন সাহেব। জড়িত কণ্ঠে বললেন :

—তোমার নেশা হয়নি মহাদেব?

সম্পূর্ণ জড়তাবিহীন স্বরে মহাদেও খেতন বললেন :

—না ত'! মাটিতে লুটিয়ে পড়তে আমার লজ্জা হয় সেন। নিজেকে বিকিয়ে দিতে ঘৃণা হয়।...কিন্তু শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।

সেন সাহেব এবার চেয়ারের একটি কোণে ক্রমশঃ ঢলে পড়লেন। টেবিলের ওপর তাঁর মাথাটি মহাদেও খেতন সযত্নে রেখে দিলেন।

নিদ্রিতের মত সেন সাহেব বললেন :

—নেশার জিনিসে তোমার নেশা হয় না মহাদেব—তবে ও আর তুমি খেও না, সহ্য হবে না।

শেষের কথাগুলো একটার সঙ্গে একটা জড়িয়ে যায়। মনে হয় নিঃসাড় একটা গহ্বর থেকে কথাগুলো বেরিয়ে আসছে যেন!

আর জ্ঞান নেই। সাড়া পাওয়া যায় না সেন সাহেবের। কি করবেন ভেবে পান না মহাদেও খেতন। ডাকবেন ইরাকে!

ইরা যায়নি। পর্দার ওপারে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে ঢুকল এবার।

কোন দিকে না তাকিয়ে ইরা বললে :

—খুব নেশা নেশা খেলেছেন দু' বন্ধুতে মিলে। এবার দয়া করে একটু ধরুন, নয়ত' সারা রাত এই এঁটো-কাঁটার মধ্যেই পড়ে থাকবেন।

মহাদেও খেতন উঠে দাঁড়ালেন। মনে নেশা হয়নি, কিন্তু শরীরে বেশ

একটা অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। পা-ও টলছে একটু একটু। তবু ইরার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। দুজনে মিলে সেন সাহেবকে শোবার ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন।

সযত্নে একখানা চাদর দিয়ে সেন সাহেবকে ঢেকে দিয়ে ইরা বললে: —আপনি বাড়ী যেতে পারবেন ত'?

কেমন বিচিত্র সুরে হাসতে হাসতে মহাদেও খেতন উত্তর দিলেন:

—বাড়ী হলে পারতুম না। হোটেল বলেই পারব।

ইরা বিলোল-চকিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে:

—যত সহজ মনে করেছিলুম—আপনি তত সহজ মানুষ নন। চলুন আপনাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি?

—তবে আর এত রাতে আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত নাই বা গেলেন?

মহাদেও খেতন সম্বন্ধে সেন সাহেবের একটা মন্তব্য ইরার মনে পড়ে যায়। সেন সাহেব বলেন—যার ব্যক্তিত্ব দৃঢ় নয়, তার দু'চারটে সংস্কার থাকা ভাল, নয়ত' তার মনুষ্যত্ব নিমেষের প্রলোভনে বা উত্তেজনাতেই লোপ পেয়ে যায়।

সেই কথা মনে পড়তে ইরা বললে:

—সেদিকে ভয় নেই—সঙ্গে পাহারা থাকবে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহাদেও খেতন বললেন:

—পাহারা কোথায়?

—আপনার ভেতরকার সংস্কার।

ইরা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মহাদেও খেতন তাকে অনুসরণ করলেন। রাত-ও গভীরতার দিকে পা বাড়িয়েছে।

সেদিন একটা দুর্বল মুহূর্তে মহাদেও খেতন আলেখ্য-দর্শন করালেন সেন সাহেব আর ইরাকে। জীবনটাকে নিপুণ চিত্রকরের তুলিতে এঁকে এদের সামনে তুলে ধরলেন। শ্যামাবাঈর কথাও বাদ যায়নি। শুনতে-শুনতে ইরা কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল।

সেন সাহেব আর একটি পাত্র নিঃশেষ করে বললেন:

—মহাদেব তোমার বয়েসই বেড়েছে, কিন্তু ভেতরের কাঠামো শক্ত হয়নি। কাঁচা কাঠের আসবাব তুমি, তাই সহজেই ঘুণ ধরে যায়!

—এর পরও আমায় কি করতে বল তুমি?

মাতালের হাসি আর কান্নায় সহজে তফাৎ বোঝা যায় না। সেন সাহেব হাসলেন কিনা বোঝা গেল না।

—কিছুই করতে বলি না—আমি নাস্তিক। তোমার বিবেক বুদ্ধি আর আমার বিচার এক হতে পারে না; কিন্তু মনে হয় তোমার এ পরিবেশটা থাকবে না। কোন বৃহত্তর পরিবেশ তোমায় ডাক দিয়েছে।

মহাদেও খেতন সকৌতুকে হাসলেন:

—ডাক দিয়েছে! তহলে প্রবেশ পথও দেখিয়েছে বোধ হয়, কিন্তু কোথায়?

হাসিটা গায়ে মাখবার মত অবস্থা নেই সেন সাহেবের। নিজের ঝোঁকেই তিনি চলেছেন।

—পথ? পথ শ্যামাবাঈ—

—কি বলছ তুমি!

স্বরের বিরক্তি মহাদেও খেতন ঢাকা দিতে পারলেন না। দিলেন-ও না।

—ওর কথা আমি ভাবতেই পারি না।

—ভাবতে পার না, কিন্তু বললে কি করে?

—জানি না কি করে বললুম! কিন্তু ওকে আর আমি স্ত্রী রূপে কল্পনা করতে পারি না। কমলকে আমি ভুলতে পারি নি। যে বাড়ীতে অন্য লোক নিঃশ্বাস ফেলে সে বাড়ীতে পর্যন্ত আমি থাকতে পারি না। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। তাই পৃথিবী জোড়া প্রাসাদ আর আকাশ জোড়া ছাদ আমি চাই না। আমি ততটুকুই চাই, যতটুকু আমার। শ্যামাবাঈ ত' শুধু আমার নয়।

বেদনাতুর স্বরে সেন সাহেব বললেন:

—একটা ভুলই তার জীবনে সব চেয়ে বড় হয়ে থাকবে! যদি মনে করি, শ্যামাবাঈর জীবন ত' নষ্ট হয়েই গেল, কিন্তু এতে তোমারও পরাজয়।

—কিসে?

—কিসে নয়? সব দিকে। কে এক কমল, তার ছায়ায় শ্যামাবাঈ

উন্মাদ হয়ে গেল, আর তুমি ভালবেসেও তাকে বাঁচাতে পারলে না। শুধু স্বপ্নই দেখলে, সার্থক হলে না।

ইরা নিবিষ্ট চিত্তে এদের কথা শুনছে, কিন্তু তার মনে সব প্রবেশ করছে না, কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লজ্জা হ'ল তার। তর্কে স্বামীর পরাজয় কামনা করছে সে। কোন্ এক অজ্ঞাত শ্যামাবাঈ, তার প্রতি ঈর্ষা জাগছে কেন? মন থেকে এ ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সেও কথায় যোগ দেয়।

মহাদেও খেতন বললেন :

—পরাজয়ই হোক, তবু আমি শ্যামাবাঈকে চাই না।

ইরা বললে :

—তর্ক দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গড়ে দেওয়া যায় না, মহাদেব বাবু, ও চেষ্টা আমরা করব না। আপনি নিজের ইচ্ছায় চলুন।

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে ইরা তাঁকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করলেও মহাদেও খেতন খুশি হলেন না। ইরার বলার ভঙ্গিটা তাঁর ভাল লাগেনি।

মহাদেও খেতন বললেন :

—তুমি বৃথাই চেষ্টা করছ সেন। ইরা ঠিকই বুঝেছে, তর্ক দিয়ে আমার বিশ্বাসটাকে বদলে দিতে পারবে না। এ বিশ্বাস আমার রক্তের সঙ্গে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া কোথায় শ্যামাবাঈ! কোথায় সে হারিয়ে মিলিয়ে গেছে, কে জানে?

সেন সাহেবের নেশা যেন সেই মুহূর্তে কেটে গেল। সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

—মে' ছেলে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় বটে, কিন্তু সে আমাদের দোষে। আর হারিয়ে গেলেও মিলিয়ে যায় না। ইচ্ছে করলে তাকে ঠিকই খুঁজে বের করতে পারবে।

একটু থেমে সেন সাহেব আবার আরম্ভ করলেন :

—আর বিশ্বাসের বাঁধটা আরও উঁচু করে দাও মহাদেব, নয়ত প্রতি পদে ডুবে যাবে! সংস্কারের গণ্ডীটাকেও বাড়িয়ে দাও, যাতে ক্ষুদ্র শৈথিল্যগুলো তাকে বেঁধে ফেলতে না পারে।

ইরা এবার সেন সাহেবকে বাধা দিলে :

—তুমি আজ বড় বেশী বকছ—থাম ত'।

—বেশ থামলুম—

সোফার ওপর গড়িয়ে পড়তে পড়তে সেন সাহেব বললেন :

—কিন্তু আমার শেষ কথা কি জান ইরা? মানুষের জীবনে ছোট-খাট ভুল হওয়া ভাল, ওতে দৃষ্টির ব্যাপকতা বাড়ে। আমি ক্ষতহীন নটে গাছ হতে চাই না, বাজ-পড়া শালগাছ হতে চাই। আমার বিশ্বাস, ঐ ভুলের মাশুল দিতে শ্যামাবাঈ ক্ষয়ে যায় নি; তীক্ষ্ণধা হয়েছে—তাকে পেলে আমাদের মহাদেবও মানুষ হতে পারত। স্বার্থময় কেনা মাটির মোহ কাটান সত্যিকার মানুষ!

এবার মহাদেও খেতন হাসলেন। অপ্রকৃতিস্থ সেন সাহেবকে একটা নাড়া দেবার প্রচেষ্টায় বললেন :

—বেশ কথা বলেছ—শ্যামাবাঈকে পেলে আমি কেনা মাটির মোহ কাটান সত্যিকার মানুষ হব!

সেন সাহেব বুঝলেন, তাঁর উক্তিটাকে মহাদেও খেতন ব্যঙ্গ করছেন, তাই নিজের কথায় জোর দিয়ে বললেন :

—হাঁ, ঠিক কথাই বলেছি—শ্যামাবাঈকে ত' তুমি তোমার দর্পের কেনা মাটিতে বসান কল্পনার স্বর্গ সিংহাসনে পাবে না—ওকে পেতে হলে তোমায় মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে হবে—যে মাটি কেনা যায় না।

তর্কটা আজকাল বড় ঘন ঘন বেধে যায়। সমাধান কিছুই হয় না। বড়-বড় কথার গাম্ভীর্যে আবহাওটা ভারী হয়ে থাকে। সেন সাহেব আর মহাদেও খেতন—এই দুই প্রতিপক্ষকে সামনা-সামনি দেখলে ইরা আজকাল সেখান থেকে সরে যেতে চায়।

সেন সাহেব মাঝে-মাঝে বলেন :

—এইত বেশ ছিলে, যেই মহাদেব এল অমনি তোমার ভেতর থেকে কাজের তাগিদ উপস্থিত। বস এইখানে।

ইরা যেতে-যেতে ফিরে চায় :

—এই, এখুনি আসছি।

কোনদিন বা নিয়ম রক্ষা করতে ফিরে আসে। কোনদিন হয়ত ফেরে না।

সেন সাহেবের নির্দেশ মত মহাদেও খেতন নিজে আলমারী থেকে বই বের করেন। পাতা খোলেন। পড়েন।

তবু মাঝে-মাঝে সেন সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠেন :

—কেস আমার নয়, মহাদেব, তোমার। তুমি যদি আমায় একটু হেল্প না কর, কি করে চলে ?

সেন সাহেবের উত্তাপের ওপর ঠাণ্ডা জলের স্রোত গড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন মহাদেও খেতন। খুব নরম গলায় বলেন :

—কেন ! যেমন-যেমন বলছ, তেমনিই ত' করছি ?

মাথা নীচু করে ব্রিফের এক জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ টানতে-টানতে সেন সাহেব প্রতিবাদ করেন :

—তা যে করছ না তা তুমি যেমন জান, আমিও তেমনি জানি। কি হ'ল তোমার মহাদেব ! আচ্ছা, ইরার সঙ্গে কি তোমার আজকাল বনছে না ?

—মানে ?

—ঝগড়া-ঝাঁটি করেছ নাকি—ওর অভিমান আবার বড় বেশী কিনা !

—ঝগড়া-ঝাঁটি হলে তুমি জানতে পারতে না ?

সেন সাহেব হাসলেন :

—তোমরা যখন কথা বল তখন আমার ত' সমাধিবস্থা—কিছু কানে যায়, কিছু যায় না। আমার মনে হয়—

—কি ?

হঠাৎ নিজেকে আয়ত্বে এনে ফেলেন সেন সাহেব। সামান্য একটু অন্যমনস্কতায় তিনি কোথায় চলে যাচ্ছিলেন যেন !

অন্যদিকে মোড় ফেরালেন সেন সাহেব !

—হাঁ, কি বলছিলাম যেন ! রেসজুডিকেটা—সেকসন ইলেভন্ সি. পি. সি। চিটলের বই থেকে পড়।

মহাদেও খেতন বই খুলে পড়তে আরম্ভ করেন। সেন সাহেব দু'একটা শব্দ শোনার পর হঠাৎ বলে ফেলেন :

—মহাদেব তুমি একটা ধূমকেতু।

—মানে!

—শ্যামাবাঈর বিষয় কি ঠিক করলে?

আবার পুরনো প্রসঙ্গ উঠবে। আবার তর্কের ফোয়ারা ছুটবে—মহাদেও খেতন পূর্বাহ্নেই বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

—কিছু ঠিক করিনি, করবও না।

—আমি ত' ঠিক করে রেখেছি।

—কার! শ্যামাবাঈর?

—না।

—তবে?

—ইরার।

মহাদেও খেতন চমকে উঠলেন।

বিক্রের কাগজ-পত্র বাঁ-হাতে সরিয়ে রেখে সেন সাহেব বললেন:
—ও' ঘর থেকে সংস্কার-প্রক্ষালনী সুধার আধারটা এনে দাও ত' মহাদেব?

এতটা বাংলা মহাদেও খেতন বোঝেন না। সেন সাহেব আবার বললেন:

—হুইস্কির বোতল আর একটা গেলাস। না, হুইস্কি থাক, ওটা পেটে গেলে তোমায় হয়ত খুন করে ফেলব—তার চেয়ে শ্যাম্পেন এনে দাও। মিষ্টি নেশায় মিঠে আলাপ করা যাবে।

মহাদেও খেতন আদেশ পালন করলেন।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সেন সাহেব আবার বললেন:

—ইরাকে বিয়ে করবে?

কথাটা শুনে মহাদেও খেতন যেন চমকে উঠলেন, কিন্তু সে-ভাবটাকে চাপা দিয়ে তাচ্ছল্যের সুরে বললেন:

—পেটে দু-ফোঁটা যেতে না যেতেই নেশা ধরেছে—! তুমি নিজের মনে বক্-বক্ কর, আমি চললুম।

সেন সাহেব মহাদেও খেতনের হাত চেপে ধরলেন:

—না, বস। তুমি যদি চাও, আমি খাঁচা খুলে দিতে পারি।

—ছি-ছি—

—কেন মহাদেব, ছি-ছি, কেন! তোমাদের তো ভালবাসা হয়েছে?

অসহায়ের মত মহাদেও খেতন বলেন:

—কে বলেছে?

—কেউ নয়!

—তবে?

গেলাসটি ঠক্ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সেন সাহেব বলেন:

—ইরাও তোমাকে ভাল বেসেছে।

মনে খানিকটা সরস কৌতূহলের উদয় হলেও মহাদেও খেতন তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন:

—বলেছে ও?

—হুঁ। অবশ্য এখন সেজন্যে তার অনুশোচনা হয়েছে। তুমি তাকে একদিন স্পর্শ করে ছিলে, না? ইরা আমায় সে-কথা বলেছে। বিছানায় পড়ে ফুলে-ফুলে কেঁদেছে। বলেছে তোমায় তাড়িয়ে দিতে।

এরপর কি বলবেন মহাদেও খেতন ভেবে পেলেন না। একদিন, মানে গত বুধবার, একটা সাময়ীক উত্তেজনা এসেছিল তাঁর। মনে হয়েছিল ইরারও সম্মতি আছে। সেখানেও এসে দাঁড়িয়েছিল চম্পাবাঈ। চম্পাবাঈ বলে তিনি ডেকেও ছিলেন ইরাকে। সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে। কি একটা হয় যেন তাঁর। সব গুলিয়ে যায়। স্বর্গত চম্পাবাঈ, পাগলিনী শ্যামাবাঈ আর আধুনিকা ইরা সব মিলে একাকার হয়ে যায়! উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি। ভালবাসা জানাতে বা সকাম হাত বাড়িয়ে দিতে একটুও দ্বিধা হয় না। শ্যামাবাঈকে আলিঙ্গন করতে তাঁর বুক উদ্বেলিত হয়নি। অচৈতন্য সেন সাহেবকে দু'তলার ঘরে শুইয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ইরাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, ভাবেননি ইরা চমকে উঠবে। চমকায়নি সে।

কিন্তু কেমন এক অবশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, ছাড়ুন।

আর কিছু নয়। তারপর পথে আসতে-আসতে সব কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন চম্পাবাঈর সব দিনকার সব রকম সাহচর্যের কথা মনে পড়ে না, এও তেমনি। তেমনিই অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণের পর স্বাভাবিক বিস্মৃতি।

আবার গেলাসটা পূর্ণ করে নিয়েছেন সেন সাহেব। একটি-একটি করে চুমুক দিচ্ছেন, আর সবিস্ময়ে নিজের মনটাকে উন্মুক্ত করে দেখছেন। সত্যিই বিচিত্র বলে মনে হচ্ছে ভেতরটা। মহাদেবের ওপর রাগ হয় না। ইরাকে ঘৃণা হয় না! পরিবর্তে একটা অসীম মমতা জাগে এদের ওপর। ইরার ওপর, সামনে বসে আছে যে অপদার্থ মহাদেবটা, তার ওপর। যাকে কোনদিন দেখেন নি, শুধু নামটুকুই শুনেছেন, সেই অপরিচিতা শ্যামাবাঈর ওপর।

নিজের ত্রুটি আবরিত করতে নারীর যা স্বাভাবিক দাবী, সেই দাবীই ইরা জানিয়েছে! বলেছে, ওকে তাড়িয়ে দিও।

সেন সাহেব উত্তর দিয়েছেন, তা আমি পারব না ইরা। আমি জানি, মহাদেবের মত লোক যত উপাদেয়ই হোক ডাকাতি করে না। বিনা আমন্ত্রণে কিছু স্পর্শ করতে পারে না—ওর সংস্কারে বাধে। তোমার দিক থেকেও দুর্বলতা ছিল, তাতেই মহাদেব ডুবেছে।

—তুমি আমায় অবিশ্বাস করলে—বিস্ময়টাকে ইরা চোখের জলে প্রকাশ করেছিল।

সেন সাহেব বলেছিলেন, আমার বিশ্বাসের গণ্ডী অনেক বড়, ওর বাইরে তুমি কোনদিন যেতে পারবে না। আমি মহাদেব নই ইরা, যে তোমার সামান্য একটা বিচ্যুতি দেখে জ্বলে-পুড়ে মরব।

এরপর ইরার আর কি থাকতে পারে! কঠিন একটা স্পর্শের মধ্যে নিজের সমস্ত দুর্বলতা আর বিভ্রান্তি বিলুপ্ত করে দেওয়ার বাসনায় সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। তারপর সেন সাহেবের বুকের মধ্যে নিজের হৃদয়ের স্পন্দন মিশিয়ে দেবার আকুল চেষ্টায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেছে, জান মহাদেব আমায় চম্পাবাঈ, চম্পা বলে ডেকেছিল!

ইরার পিঠে, মাথার চুলে, হাত বোলাতে-বোলাতে সেন সাহেব বলেছিলেন, তাই ওর ওপর আমার রাগ হয় না। মহাদেব স্বভাব-মন্দ নয়, ইরা। ওর জীবনের মর্ম বোঝার আগেই চম্পাবাঈকে হারিয়েছে, তাই সামনে যাকে দেখে তার মধ্যেই চম্পাবাঈকে খোঁজে। ও ভালবাসতে চায়, কিন্তু কি একটা মোহ আর সংস্কার আছে যার চাপে সে নিজেই পিষে মরছে।

সেদিন দু'জনকার মাঝের নিঃশ্বাসের ব্যবধান পর্যন্ত সেন সাহেব ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। আদরে আদরে নিস্পন্দ করে দিয়েছিলেন ইরাকে।

অনেকক্ষণ দু'জনেই আত্মমগ্ন ছিলেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে সেন সাহেব বললেন :

—কি মহাদেব উত্তর দিলে না ?

—কিসের ?

—ঐ যে বললাম, বিয়ের কথা ? তোমার যদি আগ্রহ থাকে, আর ইরার যদি আপত্তি না থাকে—

মহাদেও খেতন উত্তর দিলেন না। চুপ করে ভাবতে লাগলেন। মনে হয় সেন সাহেব একটা ব্যারিস্টারী প্যাঁচ খেলছেন ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যটা মহাদেও খেতন ঠিক ধরতে পারছেন না।

—উত্তর দাও ?

মহাদেও খেতন একটু ঘুরিয়ে সেন সাহেবের উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করেন :

—কি উত্তর দেব ! আর আমার ইচ্ছে যাই থাক, সব জেনে ত' তুমি ইরাকে নিয়ে থাকতে পার না-?

সেন সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলেন :

—কেন পারব না ! নারীর মন ত' আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নয় যে একবার ফসকে গেলে জ্ঞাতিতে লুটে নেবে। এর পরও সে যদি আমায় আশ্রয় করে থাকতে চায় আমি সুখীই হব—আগের চেয়েও খুশি হব। জানত, গ্রেট মেন মেক গ্রেটার রংস্—ইরা ছিল সামান্য নারী, তোমার প্রেমে ঘা খেয়ে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছে। এতদিন তার প্রেমে মোহ ছিল, এখন স্থৈর্য এসেছে। এখন আমি তার ওপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করতে পারি।

মহাদেও খেতন আবার চিন্তার কোলে ঝিমিয়ে পড়েছেন। চম্পাবাঈ মারা গেছে। ইরা সেন সাহেবের হাতে গভীরতর অনুভূতি নিয়ে ধরা দিয়েছে। দুটি সুরের তার তাঁর জীবনের বীণা থেকে ছিঁড়ে গেছে। আর একটা তার ছিল—এতদিন তার সুরটা ঐ দু'টি তারের সুরের মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল। আজ হঠাৎ অসংলগ্ন তারটি তাঁর বৈরাগী মনের হাতে

বেজে উঠল। মনে পড়ে গেল শ্যামাবাঈকে। সমস্ত সম্পর্ক সমস্ত কলঙ্কের জড়তামুক্ত চিরন্তনী সুরের একতারাটিকে।

সেন সাহেব জাগিয়ে দিলেন :

—কি ভাবছ মহাদেব ?

—কিছু না।

তারপর মহাদেও খেতন বললেন :

—আচ্ছা সেন ! আমার কেসগুলোর অবস্থা কি রকম, বলতে পার ?

—তুমি জিতবেই।

—শোভারামজী কি বলে, জান কিছু ?

—তিনি কিছু বলেন কিনা জানিনা, তবে তাঁর উকিল কমপ্রোমাইজের কথা বলছিল।

—বলছিল ! শোভারামজী জানে হারবেই ?

—মনে মনে অবশ্যই জানে।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে মহাদেও খেতন বললেন :

—দেখ, তুমি কালকের মধ্যেই সব কেস তুলে নাও—আমি কাল ভাগলপুর ফিরতে চাই।

সেন সাহেব বললেন :

—লড়বে না ?

—না।

সেন সাহেব হাসলেন।

—এই বোধহয় তোমার সঙ্গে শেষ দেখা ? এস তোমার স্বাস্থ্য পান করি।

একটি পাত্র সেন সাহেব নিঃশেষ করলেন।

—আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হবে না, ইরা স্টেশন যাবে তোমায় সী-অফ্ করতে।

আর একটি পূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে বলিষ্ঠ কান্তি দীর্ঘ দেহ সেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মুখে স্মিত হাসি। রক্তাভ চোখ দুটিতে স্বপ্ন নেমেছে।

উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সেদিকে মহাদেও খেতন তাকিয়ে রইলেন।

মহাদেও খেতনের কামরাখানা খুঁজে নিয়ে ইরা সামনে এসে দাঁড়াল।

বেঞ্চের এককোণে মহাদেও খেতন বসে আছেন। প্রথম শ্রেণীর প্রায়-শূন্য কামরা; তবু বিছানাটা খোলা হয়নি।

ভেতরে ঢুকে ইরা ডাকলে:

—মহাদেব বাবু।

—ইরা!

এক ঝলক খুশি মহাদেও খেতনের আলো-ছায়া মাখান মুখের ওপর ফুটে উঠল।

ইরা সরে এসে অন্য বেঞ্চটায় বসল।

—গাড়ী ত' খালি, বিছানাটা পেতে নেননি কেন?

মহাদেও খেতন হাসলেন।

—পাতলে আবার গোটানর ঝঞ্ঝাট আছে।

আদেশের সুরে ইরা বললে:

—উঠুন ত' একটু—নিজে না পারেন আমিই পেতে দিচ্ছি।

—থাক না?

—না, উঠুন—

বিছানাটা পরিপাটি করে পেতে দিয়ে ইরা বললে:

—বসুন এবার।

মহাদেও খেতন বসলেন। ইরা দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভেবে ইরা বললে:

—মাঝে মাঝে আপনার বন্ধুকে চিঠি দেবেন ত?

—চিঠি! ও আমি কোনদিনই লিখিনা।

উত্তর শুনে ইরা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটু ম্লান হাসি হেসে চুপ করে রইল সে।

মহাদেও খেতন প্রশ্ন করলেন:

—হাসছ কেন?

ইরা অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছিল। পাশের লাইনে একটা রোষান্বিত এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে।

সেটির দিকে চোখ রেখে ইরা বললে :

—আপনার কথাই ভাবছি—যখন এলেন বানের জলের মত এলেন, যখন যাচ্ছেন সব চিহ্ন মুছে নিয়ে যাচ্ছেন। আর—

ইরার বাকী কথাটা মহাদেও খেতন নিজেই শেষ করে দিলেন :

—আর সব ভেঙেচুরে গেলুম ?

ইরা আবার চুপ করে রইল। পাশের লাইনের এঞ্জিনটা চলে গেল। লাইনের ওপর দিয়ে একটা নির্ভীক কুলি হেঁটে যাচ্ছে।

—ওদিকে কি দেখছ ?

মহাদেও খেতন জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিছু নয় ত'।

এদিকে মুখ ফিরিয়ে ইরা শান্ত চোখে তাকাল।

—আজ দাড়ি কামাননি কেন ?

গালে হাত বুলিয়ে মহাদেও খেতন সবিস্ময়ে বললেন :

—তাইত! ভুলে গেছি কামাতে।

একটু থেমে আবার বললেন :

—ভেতরের কিছু ভুলতে পারিনি বলে, বাইরে কেবলই ভুল হয়ে যাচ্ছে।

ইরার মুখটা আরক্তিম হয়ে গেল। নিমেষে অনেক কথা মনে পড়ে গেল তার। মহাদেও খেতনের মুখের ওপর থেকে লজ্জামাখা দৃষ্টি তুলে নিয়ে ওধারের শূন্য লাইনটার ওপর স্থাপন করলে সে।

তারপর বললে :

—সব কথা ভুলতেই বা যাবেন কেন! সবই ত' ভুল নয়।

মহাদেও খেতন অসহায়ের ভঙ্গীতে বললেন :

—তবে থাক। কিছুই ভুলব না।

উত্তরের ভঙ্গী শুনে ইরা হেসে ফেলল।

—আপনি দেখছি সিদ্ধ পুরুষ! ভোলা ইচ্ছাধীন করে নিয়েছেন ? কিন্তু এবার আমায় নামতে হবে, গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেছে।

মহাদেও খেতন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। উত্তর দিতে পারলেন না।

ইরা সাগ্রহে তাঁর মুখ দেখবার চেষ্টা করে।

—অনুমতি দিন ?

—না !

—নামতে দেবেন না !

ইরা ম্লান বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলে।

মহাদেও খেতন আবার তার দিকে মুখ ফেরালেন ! ইরা তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাকুল পলকহীন দৃষ্টি। রক্তের মধ্যে যেন তার অশ্রু-কণা সঞ্চারিত হয়েছে—কিন্তু স্রোতটা বহু আয়াসে সংযত করে রেখেছে ইরা।

—না, তোমায় আর থাকতে বলব না।

ইরার ওপর শেষ দর্শনের দৃষ্টি বুলিয়ে তার অধ্যায়টা সেখানেই শেষ করে দিয়ে মহাদেও খেতন জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ইরা ভুলতে বারণ করেছে, তিনি ভুলবেন না।

বাড়ী পৌঁছানোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মহাদেও খেতন পথে বেরিয়ে পড়লেন। তুলারাম পাঁপড়ওয়ালার বাড়ী বেশী দূর নয়। এই গলিটার পর ডাকবাক্স ঝোলান নিমগাছটা ছাড়িয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়বেন। কিন্তু তারপর জানেন না। পাঁচ-সাত খানা ছোট-বড় বাড়ী আছে ওখানে। তারই একটা একতলা বাড়ী। এতটুকু নির্দেশ শ্যামাবাঈর কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। কথায় কথায় বলেছিল, সেদিন দুপুরবেলা।

—জয় গোপাল।

মহাদেও খেতন মুখ তুললেন। অভিনন্দনকারীকে চেনেন না, তবু মুখে পরিচিতের হাসি টেনে বললেন :

—জয় গোপাল।

ভাবলেন তুলারামের বাড়ীর পথনির্দেশটা তার কাছ থেকেই নিয়ে নেবেন, কিন্তু ইচ্ছে হল না। নিজেই খুঁজে বের করবেন। আজ সবকিছু সযত্ন প্রয়াসে অনুসন্ধান করবেন তিনি। বুঝলেন এ এক নতুন ধরণের বিলাসিতা, তবু ভাল লাগল।

লোকটি সামনে এসে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়াল। মহাদেও খেতনকে সে কোন একদিন এ গলিতে হাঁটতে দেখেনি। সে কেন, কেউই দেখেনি কোনদিন।

—কোথায় যাচ্ছেন?

—তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা—

খেতনরা কোনদিন কারও বাড়ী যায় না—এ কথা সুবিদিত।

লোকটি সামনে এগিয়ে এল।

—আপনি দাঁড়ান এই নিমগাছটার কাছে, আমি ডেকে আনছি।

—না থাক, জয়গোপাল—

সামনে এগিয়ে গেলেন মহাদেও খেতন। না হয় সব বাড়ীতেই কড়া নেড়ে দেখবেন। ফাগুনের আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমেছে। দু'এক ফোঁটা বর্ষণ হলে মন্দ হয় না। ওঃ, কতদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয়নি! চম্পাবাঈর মৃত্যুর পর একদিনও নয়।

কড়া নেড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মহাদেও খেতন। সদর দরজার চৌকাঠের মাথায় গোটা পাঁচ-ছয় প্যাঁচার মূর্তি খোদাই-করা একটা কাষ্ঠ-ফলক পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। বর বিয়ে করতে এসে নিম-ডাল দিয়ে আঘাত করে এই ফলকটার ওপর। এ বাড়ীর কোন মেয়ের দু'চার বছরের মধ্যে বিবাহ হয়েছে, তারই প্রতীক চিহ্ন। হয়ত সিমন্তিনী শ্যামাবাঈর সৌভাগ্য ঘোষণা করছে এই ফলকটা। আচমকা মহাদেও খেতনের বুকটা একটু মুচড়ে উঠল। ফলকটার পাশে ফণী মনসার কাঁটা ঝোলান আছে। সমস্ত চৌকাঠটাই গোময়-চন্দন-সিন্দুর অভিষিক্ত। অন্য মনে মহাদেও খেতন ফণী মনসার একটা কাঁটা নখে করে ভেঙে নিয়েছেন, দুটো আঙুলের মাঝে নাড়া-চাড়া করছেন কাঁটাটিকে।

—দীপা, ও দীপা, দেখনা কে তখন থেকে কড়া নাড়ছে?

—তুমি দেখনা, মা'জী আমি কাজ করছি।

—দীপা!

শেষ সম্বোধনটি বেশ উচ্চগ্রামের নারীকণ্ঠ। এতেই কাজ হল।

দীপা দরজা খুলতে মহাদেও খেতন পরিচিতের স্বরে বললেন:

—তোমার বাবুজী বাড়ী আছেন, দীপা?

নামটা বাইরে থেকেই শুনতে পেয়েছিলেম তিনি।

—না।

—কোথায় ?

—শিবালা গেছে।

—পূজো করতে ?

—না, দেখছেন না, আকাশে বাদল এসেছে ? জলের বাজি খেলতে গেছে ?

—কখন ফিরবেন ?

—কি করে জানব ! কখন বৃষ্টি হবে, টাকা পাবে, তার পরে ত' ?

শিবালা ! হাঁ, শিবালা চেনেন মহাদেও খেতন। ওরই পাশে একটা ছোট বেদী। বেদীর ওপর মহাদেবের ত্রিশূল পোতা আছে। আপদে-বিপদে মাড়োয়ারী টোলার সকলে এই ত্রিশূলের শরণাপন্ন হয়। স্বপ্নাদেশ হয় কতজনের—ত্রিশূল ধোওয়া জল খাও, রোগ সারবে। ছেলেবেলায় বড় অসুখের সময় তিনি খেয়েছেন। দাদীজী সখীচাঁদ ঘাটে গঙ্গাস্নান করে নগ্নপায়ে এতদূর হেঁটে এসেছিলেন।

নিজের হাতে ত্রিশূল ধুয়ে জল নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি :

এ জলটা খেয়ে নে মুন্না, সব আরাম হয়ে যাবে।

এই ত্রিশূল-ধোয়া জল শ্যামাবাঈও খেয়েছে। চম্পাবাঈর অসুখের সময় কথা হয়েছিল জল আনবার। কিন্তু সময় পাওয়া যায়নি। বড় তাড়াতাড়ি মারা গেল সে।

বেদীর ওপরকার ছাদে বাঁকাভাবে দুটো নালি দেওয়া আছে। ওরই বাজি ধরা হয়। বৃষ্টির জল নালি বেয়ে গড়িয়ে পড়বে কি না পড়বে, তারই ওপর বাজি। মুণিমজীও মাঝে মাঝে বাজি খেলতেন। উদ্দীপ্ত মুখে সেসব গল্প শোনান কখনও কখনও।

আকাশের দিকে তাকালেন মহাদেও খেতন। এখন জলের দর কত হবে। কত, ঠিক এই মুহূর্তে। বিশ ? না, পনেরোর বেশী নয়। মেঘের সঞ্চার ত' ক্রমশঃই ঘনীভূত হচ্ছে। মুণীমজী বোধহয় তৃষিত চাতকের মত বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স হয়ে গেছে বলে আর খেলেন না, কিন্তু নেশা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। নিজের মনেই বক্‌বক্ করেন

—বিশমে দুশ' লাগায়া। পাঁচশ' লাগায়া পনরহ মে। অর্থাৎ বৃষ্টির জল নালি বেয়ে পড়লে, প্রতি এক টাকায় বিশ টাকা হিসেবে পাবেন দুশ' টাকার ওপর, কিংবা প্রতি টাকায় পনেরো টাকা পাবেন পাঁচশ' ওপর। হারলে খেসারৎ যাবে ঐ হিসেবেই।

শিবালার সামনে যখন মহাদেও খেতন উপস্থিত হলেন তখন জলের দর অনেক পড়ে গেছে। মাত্র তিন টাকা। চীৎকারে চতুর্দিক ভরে গেছে।

—তিন রূপায়া মে তিনশ' লাগায়া—

—তিন রূপায়া মে পাঁচ লাগায়া—

পাঁচ রূপায়া লাগানেওয়ালার চেহারাটি মহাদেও খেতন ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলেন। ভীড়ের চাপে হারিয়ে-থাকা মানুষের একটা অংশ থেকে ভেসে আসছে—তিন রূপায়া মে পাঁচ রূপায়া—পাঁচ রূপায়া—

এতক্ষণে ঘোষকটিকে মহাদেও খেতন দেখতে পেলেন—নেহাৎই ছেলেমানুষ।

কিন্তু এই ভীড়ে তুলারামজীকে চিনে বের করবেন কি করে! শুধু নামের পরিচয় হবে না। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলেও সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। সমস্ত শব্দ জলের দামের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অবশ্য দাম ক্রমশঃ কমেই আসছে। দর এখন এক টাকা—না তাও নয় আর, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। একটু দূরে নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে মহাদেও খেতন ভিজতে লাগলেন।

শিবালার নালি দিয়ে টিপ-টিপ করে জল ঝরছে। ক্রমে ক্ষীণ হতে মুসলধারা। গোলমাল থেমে গেছে একেবারেই।

একজনের হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে মহাদেও খেতন জিজ্ঞেস করলেন :

তুলারামজী কোথায়?

—তুলারামবাবু পাঁপড়ওয়ালা? লক্ষ্মী স্যাঁকরার দোকান দেখুন—

এ অঞ্চলটার অন্যতম নাম সোনাপট্টি। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক দোকানের একটি থেকে তুলারামজীকে খুঁজে বের করলেন মহাদেও খেতন। চিনিয়ে দিলে একজন। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে গেল মহাদেও খেতনের। সিক্ত বসনে পরাজিত ও অপরাজিত দল পূর্ণ দমে

গঞ্জিকা সেবন করছে। ধোঁয়ায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন। দোকানের বাইরেই মহাদেও খেতন দাঁড়িয়ে রইলেন। ফাগুনের বৃষ্টি কমে এসেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি ছিটেয় বিরতি চিহ্ন ঘোষণা করছে।

এতক্ষণ মনে একটা অনির্বচনীয় উৎসাহ ছিল। এখন আর সেটিকে মহাদেও খেতন খুঁজে পাচ্ছেন না। শ্যামাবাঈ বেঁচে আছে কিনা কে জানে। থাকলেও কোথায় কি অবস্থায় আছে, বা থাকতে পারে। এ কথাটা ভেবে দেখেননি এখন পর্যন্ত। রয়ে বসে, চেকে চেকে, নতুন মানুষ, নতুন পথ আর পরিস্থিতির আস্বাদ নিচ্ছিলেন। শ্যামাবাই এই ভীড়ে প্রবেশ করতে পারেনি। এখন পথ-বিভ্রান্ত, হয়ত বা মৃত শ্যামাবাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কৌতুক-মাখা চোখ দুটি তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁ চোখের নীচ থেকে কানের পাশ পর্যন্ত কালশিরার দাগটায় মহাদেও খেতনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে হাত বোলাচ্ছে সে।

—রাম, রাম মহাদেওজী।

—রাম রাম—

মহাদেও খেতন সবিস্ময়ে দেখলেন তুলারামজী তাঁকে চেনে। তুলারামজী কেন, সকলেই চেনে। খুশি খুশি মনোভাব তুলারামজীর। বিশে পাঁচশ' পেয়েছে। গঞ্জিকা-বিলাসের পর কষ্টিপাথরের বাটিতে রাখা দুটি সুপক্ক করমচার মত লাল চোখ দুটিতে হাসি উথলে উঠছে।

—আপনি এখানে?

—আপনাকে খুঁজছি।

—আমাকে!

উদ্বেলিত হৃদয়ে মহাদেও খেতনের প্রত্যেকটি প্রশ্ন তীরের ফলার মত গাঁথা আছে। এক একটি করে নিক্ষেপ করবেন এখন।

—শ্যামাবাঈ কোথায়?

হাসির রেখাগুলো চোখের পাশ থেকে মিলিয়ে গেল, তুলারামজী প্রশ্ন করলে:

—কেন? সে মরে গেছে।

—মরে গেছে?

—হাঁ, জর-জেনানা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মানেই ফোৎ করে

যাওয়া। শ্যামাবাঈ কোৎ করে গেছে—মরে গেছে। সে এখন চামাঈন হয়েছে।

এবার মহাদেও খেতনের বিস্ময়টা যেন আরও বেড়ে গেল। চামাঈন্ হয়েছে শ্যামাবাঈ। বিয়ে করেছে কোন রবিদাসকে।

—কবে সাদি হয়েছে?

—সাদি!

হা-হা করে হেসে উঠল তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা:

—সাদি! সাদি নয়—হাসপাতালে চাকরী করছে। নাড়ী কাটছে—চামাঈন হয়েছে।

তৃপ্তি কি অতৃপ্তি মহাদেও খেতন নিজেই বুঝতে পারলেন না, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল:

আঃ! কোন্ হাসপাতাল?

—প্রাকৃতিক চিকিৎসা নিকেতন।

—কোথায় সেটা?

তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা সবিস্ময়ে বললে:

—জানেন না! খনজরপুর—

—শ্যাল ম্যাঘবরণ ক্যাশ রইল্যা সহস্র ট্যাহা লইতাম। আর শ্যাল লইয়্যা কি করব্যান, হালায়—মাইয়া ঘোরার শ্যাল থাহে না, তাই বইল্যা কি সে সওয়ারী লয় না?

তবুও ক্রেতাপক্ষের খুঁৎ-খুতানি যায় না। দু'হাজার টাকা কি হিসেবে হতে পারে? মাথায় চুল পর্যন্ত নেই! বড় জোর দু' শ'—

—আহেন, আহেন! দুই শৎ ট্যাহায় দুই মণ মৎস্য মেলে না, দুই শৎ ট্যাহায় ডবগা মাইয়া লিবেন। আহেন সাচ বদনে শ্যামমা লইয়া য্যান।

এ পারের গঙ্গা অনেক দিন হল শুখিয়ে গেছে। বছরে ন' মাস হেঁটে পার হওয়া যায়। শঙ্করপুর দিয়ারার ওধারে বড় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন পণ্ডিত রামরূপ ওঝা। স্নান শেষে সূর্যপ্রণাম শুরু করেছেন সদ্যমাত্র, এমন সময় একটা শোরগোল কানে এল। ক্রমশঃই যেন বেড়ে

যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে গঙ্গা যেখানে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়েছে, সেদিক থেকেই আসছে শব্দটা।

সূর্যপ্রণাম অসমাপ্ত রেখে শব্দটা লক্ষ্য করে ওঝাজী পশ্চিম দিকে চললেন। ওখানে গঙ্গা কিছুটা ক্ষীণবক্ষা। পূর্ববঙ্গীয় ধীবররা মহাজাল দিয়ে দু'তীর বেঁধে দিয়েছে। ঠিক গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে।

নিমেষেই ওঝাজী ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। দুটি পক্ষের মাঝে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল, নিশ্চুপ। তারই মূল্য নির্ণয় হচ্ছে।

ধীবররা বিক্রী করতে চায়। ওদের কুটিরের পাশে রাত থেকে মেয়েটিকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। স্নানার্থিনীর মত নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওঝাজী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। খুব সুস্থ চিত্ত বলে মেয়েটিকে মনে হল না। কিন্তু অস্বাভাবিক আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টি আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ভরা বিস্রস্ত বেশ-বাস ছাড়া মস্তিষ্ক বিকৃতির আর কোন লক্ষণ নেই।

ওঝাজী এগিয়ে গেলেন :

—কে তুমি ?

—শ্যামাবাঈ।

—এখানে কি করতে এসেছ—কখন এসেছ ?

—রাত্তিরে জলে ডুবে মরতে এসেছি।

—মরনি কেন ?

—গঙ্গা বড় অন্ধকার। জলে নামতে পারিনি, ভয় করে।

উত্তর শুনে ওঝাজীর মুখে হাসি এসেছিল, কিন্তু গাম্ভীর্যের প্রলেপে সেটুকু ঢেকে নিয়ে বললেন :

—এখানে তোমায় কে এনেছে ?

—কেউ না। রাত্তিরে আলো দেখে আমি নিজে এসেছি।

—চল আমার সঙ্গে !

আরও এগিয়ে গিয়ে ওঝাজী শ্যামাবাঈর হাত ধরলেন। এবার দুটি পক্ষই বাধা দিল।

—আমাদের মাল।

—আমাদের সওদা।

ওঝাজী ধমকে উঠলেন :

—আমায় চেন ? রামরূপ ওঝার নাম শুনেছ ?

—না।

একজন বললে :

—আমি চিনি, ময়দানী হাসপাতালের ওঝাজী !

রামরূপ ওঝা হাসলেন—ময়দানী হাসপাতাল। ফাঁকা মাঠের ওপর একটা কুটির। ওখানেই নিয়ে যাবেন শ্যামাবাঈকে—লজ্জা নেই, সেবা আছে। ওঝাঈন আছে।

শ্যামাবাঈ কিন্তু বেঁকে বসল :

—আমি যাব না। আমি মরব।

সস্নেহে হাসলেন ওঝাজী। একপাল বুবুক্ষু মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে যে মেয়ের দেহের সমস্ত অংশের মূল্য কষা হচ্ছে, তার মৃত্যুর আর বাকী কি !

শুধু বললেন :

—তোমার মরা হয়ে গেছে।

—মরা হয়ে গেছে !

—হাঁ, মরা হয়ে গেছে ! আবার আমি তোমায় বাঁচিয়েছি—আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে।

ওঝাজীর সতেজ কণ্ঠের আকর্ষণ শ্যামাবাঈ অস্বীকার করতে পারল না।

—চলুন।

তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা বললে :

—শ্যামাবাঈ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, মানে ফোৎ করে গেছে—তার হিস্টারী খতম্ :

তার সুরে সুর মিলিয়েই রামরূপ ওঝা আবার বললেন :

—কিন্তু আপনার ঘরের মড়া আমার কাছেই বা থাকবে কেন ?

—ফেলে দিন আপনি। কে মানা করছে ? কিন্তু আমি ত' ফেরৎ

নিতে পারি না! মড়া বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে ফেরৎ নেবার নিয়ম শাস্তরে নেই। আছে ?

চক্ষু নিমীলিত করে সজোরে দদ্রুবিনাশ করতে আরম্ভ করল তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা। কেমন বেহায়া-বেশরম এই কাল্‌চে ফুসকুড়িগুলো। একটু উত্তেজনা বা আনন্দের আভাষ পেলেই নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করতে উন্মুখ হয়। চুড়-চুড় চুড়-চুড় করে কোমর আর কুঁচকিতে। স্থান-কাল-পাত্র বিচার নেই। সেবা চায়।

দু'দিকেই মন সংযোগের চেষ্টা করে তুলারামজী। শাস্তরে ত' মড়া ফেরৎ নেওয়ার নির্দেশ নেই। হিসটারীতে কি আছে। কি বলে হিস্‌টারী! না—আশ্বস্ত হয় তুলারামজী—ভাগবৎ গীতার চেয়ে পবিত্র তার সমাজের হিস্‌টারী! একটাও উদাহরণ নেই সেখানে।

জায়গাটা দেখে মহাদেও খেতনের মাথা গরম হয়ে উঠল। চিকিৎসা নিকেতন কি অনাথ আশ্রম বুঝে উঠতে পারলেন না। হৃষ্টপুষ্ট অনেকগুলি ছেলে প্রান্তর প্রসারিত মাঠে খেলা করছে। কচি —আধ-কচি সব। রোগী বলে ত' মনে হয়না একটাকেও।

না, রোগীও আছে ওপাশটার চালা ঘরে। আর ওদিকে ওটা কি! প্রসূতি-সদন। এতক্ষণে মাথা একটু-একটু করে ঠাণ্ডা হতে থাকে। কিন্তু ঐ বাচ্চাগুলো ?

প্রশ্ন শুনে ওঝাজী হাসলেন্‌ :

—প্রকৃতির নিয়মে এ বয়েসে ত' অনাথ হবার কথা নয়। আমি ওটাকে রোগ বলে মনে করি। যে রোগে ধরলে এ বয়েসের ছেলেগুলো ভবিষ্যতে চোর-ডাকাত-ভিখিরী হয়।

শ্যামাবাঈর কথায় এলেন মহাদেও খেতন। উদ্দেশ্যটাকে সর্ব প্রথমেই ব্যক্ত করলেন তিনি।

ওঝাজী মিট্‌-মিট্‌ করে তাকিয়ে হাসলেন একটু।

—আমি যেই কয়লা ধুয়ে হীরে বের করলাম, অমনি কেড়ে নিতে এসেছেন !

সলজ্জে হাসলেন মহাদেও খেতন।

—কেড়ে নিতে আসিনি। আপনি ওকে আমার হাতে সম্প্রদান করবেন।

—আমি! কেন ওর ভাই—?

—তার পরলোকের ভয় আছে। মৃতের হাত ধরে সম্প্রদান করতে সাহস করবে না।

অতঃপর মহাদেও খেতন একটু কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করলেন :

—আপনিই শ্যামাবাঈর চিকিৎসা করেছিলেন?

—না।

পৈতাটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে ওঝাজী বললেন :

—আমি কিছুই করিনি। এখানে আসবার পর ও নিজের মনেই হেসেছে, কেঁদেছে—যখন যা খুশি তাই করেছে। আমি কিছুতেই বাধা দিইনি। ওঝাঈন সেবা করেছে।

রামরূপ ওঝা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

—তারপর?

—তারপর লক্ষ্য করলাম, নিজেকে ভুলে শ্যামাবাঈ তার পারিপার্শ্বিকটাকে দেখতে আরম্ভ করেছে। দেখে, ও যখন কাঁদে, তখন ছেলেরা তার সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে ভয়ে-ভয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। যখন হাসে, তখন তারা এসে তার গায়ে-গলায় ঝুলে পড়ে। ওঝাঈন মায়ের মত ওর সেবা করে—কেউ নয় ওর, তবু কেন করে!

শুনতে শুনতে মহাদেও খেতনের মুখের ওপর একটা অদ্ভুত আলোর প্রলেপ পড়ে তাঁর সমস্ত মুখখানা উদ্ভাষিত হয়ে উঠল।

ওঝাজী একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন :

—দেখবেন শ্যামাবাঈকে?

—না, আজ থাক। ব্যবধান নিয়ে আর তার সামনে দাঁড়াতে পারব না—একেবারে মণ্ডপেই দেখব।

ওঝাজী হাসলেন :

—সে দেখা ত' হবেই, কিন্তু তার আগে শ্যামাবাঈর ইচ্ছেটা ত' আপনার জানা দরকার? তার যদি কোন আপত্তি থাকে—

শ্যামাবাঈর অমত! এ কথাটা মহাদেও খেতন একবারও ভেবে দেখেননি। নিজের ভাবেই তিনি প্রমত্ত ছিলেন। শ্যামাবাঈর মন হয়ত তিনি তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কিছুটা বুঝে ছিলেন, কিন্তু এখন তার রূপান্তর হয়েছে কিনা কে জানে!

সেই কথা ভেবে মহাদেও খেতন ওঝাজীকে বললেন :

—দেখা ত' করব! কিন্তু তাকে কি বলব?

মহাদেও খেতনের অদ্ভুত সরলতা-সূচক প্রশ্নে ওস্তাজীর মন খানিকটা সরস হয়ে উঠল, বললেন:

—আপনার ব্যাপার, আপনিই জানেন কি বলবেন?

—তাই ত' কি বলব!

—কি আবার! সোজাসুজি প্রস্তাব করবেন।

মহাদেও খেতন ঘাড় নাড়লেন।

—বেশ তাই করব, কিন্তু আজ নয়। কাল দুপুরে এসে দেখা করব। আপনি বরং আগে থেকে একটু বলে রাখবেন।

মহাদেও খেতন সেদিনকার মত চলে এলেন। অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। এতদিনে আলাপ শুরু হয়েছে কেবল। সম্পূর্ণ সঙ্গীতটাই বাকী।

মহাদেও খেতনকে দেখে শ্যামাবাঈ অত্যধিক মাত্রায় চমকে উঠল। তাঁর স্মৃতির বাইরে না হলেও স্বপ্নের বাইরে মহাদেও খেতন কবে চলে গেছেন। মনের চাপা কামনাটা বিপুল বিপর্যয়ের তলায় সমাধিস্থ হয়ে গেছে।

ওস্তাজী কিছুই বলেননি। একবার ভেবেছিলেন শ্যামাবাঈকে সব বলে আগে থাকতে প্রস্তুত করে রাখবেন। পরক্ষণেই সে মত পরিবর্তন করেছিলেন। স্থির করেছিলেন ওদের জীবনের বৃহত্তম প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান ওদেরই হাতে হোক।

শ্যামাবাঈ চমকিত স্বরে বললে:

—আপনি!

মহাদেও খেতন তখন তারই দিকে তাকিয়েছিলেন। দেখছিলেন শ্যামাবাঈকে—কেমন একটা সমাহিত ভাব নিয়ে কিছু লিখছিল একটা কাগজে। কাগজটা উলটে দিয়ে মহাদেও খেতনের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি!

—হাঁ, আমি।

হাসবার চেষ্টা করলেন মহাদেও খেতন—কিন্তু পারলেন না। কেমন যেন সঙ্কোচ হল তাঁর। হাসি দিয়ে দূরের মানুষটাকে ধরবার প্রচেষ্টা তাঁর নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হল।

তাই অগত্যা সোজা পথেই নেমে এলেন তিনি:

—আমি এসেছি তোমায় নিয়ে যেতে।

—আমায়! কোথায়?

ভাল করে চোখ তুলল শ্যামাবাঈ।

—আমার কাছে।

খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলে শ্যামাবাঈ :

—তা হয় না।

—কেন ?

মহাদেও খেতন তার কাছে সরে এলেন। অনেক কাছে। দূর থেকে শ্যামাবাঈর দেহটা বড় বেশী জ্যোতিষ্মতী মনে হচ্ছিল তাঁর। অপূর্ব একটা বৈরাগ্যের প্রশান্তি ফুটে উঠেছে। একে সৌন্দর্য বলা যায় না। যে রূপে দাহ শক্তি নেই তাকে সৌন্দর্যে আখ্যায়িত করতে মন চায় না। শ্যামাবাঈর দহন করার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। নিঃশেষিত হয়ে গেছে সে শ্যামাবাঈ। এ শ্যামাবাঈ সৃষ্টির আদি শ্যামাবাঈ। মাঝখানে সেতু। এপারে মহাদেও খেতন। সেতুটা এবারে বিলুপ্ত হবার সময় এসেছে। ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন মহাদেও খেতন।

মহাদেও খেতন বললেন :

—আজ আমি তোমার সম্মতি নিতে আসিনি শ্যামাবাঈ। তোমার মনে আমায় তুমি অনেকদিন আগেই তুলে নিয়েছিলে। আজ তাই তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

শ্যামাবাঈ আবার সংক্ষেপে বললে :

—আমার ভুল হয়েছিল।

—ভুল !

—তাইত আমার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

মহাদেও খেতন বুঝলেন, অভিমান ক্ষুব্ধ উত্তর দেয়নি শ্যামাবাঈ। সরল স্বীকৃতি শুনিয়েছে সে।

আবেগ-গাঢ় স্বরে মহাদেও খেতন বললেন :

—সেদিন বড় তাড়াতাড়ি আমায় নিজের মনের মধ্যে তুমি তুলে নিয়েছিলে, তখনও সময় হয়নি। তখনও তোমার মনের উপযুক্ত হয়নি—তাই—

শ্যামাবাঈ নিরুত্তরে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

মহাদেও খেতেন ডাকলেন :

—শ্যামাবাঈ !

পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে শ্যামাবাঈ তাঁর দিকে তাকাল। সেই স্বপ্নটাই আবার যেন ফিরে আসছে। ফিরে আসছে—কিন্তু উদ্দাম চপলতায় নয়। আসছে শান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে—ওটাকে বিবেক দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে সে।

শ্যামাবাঈ বললে :

—হয়ত আমার মন আজ উপযুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমি উপযুক্ত হয়নি। আপনি ত' সবই জানেন—আমার জীবনের এক জায়গায় ভাঙন আছে।

সেন সাহেবের মুখটা মহাদেও খেতনের মানস চক্ষের সামনে ভেসে উঠল।

তিনি মুখে উদার হাসি নিয়ে বললেন :

—তুমি যেটাকে ভাঙন বলছ শ্যামাবাঈ, ওটা শুধু ভাঙন নয়, জোড়ের জায়গা। তোমার জীবনের ঐ জায়গাটাতে নতুন শক্তির প্রয়োগ হয়েছে। তাই তুমি আজও বেঁচে আছ।

শ্যামাবাঈ নীরব।

মহাদেও খেতন বললেন :

—উত্তর দাও শ্যামাবাঈ ?

শ্যামাবাঈ পূর্ণতর দৃষ্টিতে তাকাল :

—নিজের জিনিসের ভাল-মন্দের বিচার আপনিই করবেন—আমি কি উত্তর দেব ?

ক্ষণিক বিরতির পর শ্যামাবাঈ আবার বললে :

—ভাইজী জানে সব ? সে আসবে না ?

বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে মহাদেও খেতন বললেন :

—তার কথা ছাড় শ্যামাবাঈ, আমরাই এগিয়ে যাব।

শ্যামাবাঈ এগিয়ে এসে মহাদেও খেতনের হাতে হাত রাখলে :

—ও কথা বললে কি চলে ! সব ছেড়ে একলা যারা এগিয়ে যায় তারা জ্যান্ত মানুষ নয়, মরা মানুষ। কিন্তু আপনি ত' আমায় বাঁচবার কথা বলেছেন ?

মহাদেও খেতন লজ্জিত হলেন। তাঁর সুগৌর মুখে সে-লজ্জার ছাপ পড়ল। তবু কতকটা যেন ছেলেমানুষের জিদ্ ধরলেন তিনি।

—কিন্তু সম্প্রদান করবেন ওঝাজী।

শ্যামাবাঈ ঈষৎ হাসল। বছর পঁয়ত্রিশেক বয়সের লোকটা যেন ভেতরে একটা শিশুর হৃদয় নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে !

—শুনেছ !

তুলারাম পাঁপড়ওয়ালার একটা বিশিষ্ট বাচন-ভঙ্গি আছে। সময় সময় সর্বজ্ঞের আসন নেয় সে। সুর শুনে ভাবীজী তার বক্তব্য অনেকটা অনুমান করে নিতে পারে।

তুলারামজীর ছাড়া জামাখানা রোদে মেলে দিতে দিতে ভাবীজী বললে :

—শুনেছি—কোন হিস্‌টারী ত' ?

—আরে না, না—

হাতপাখাটা ঘন ঘন নেড়ে বাতাস খেতে খেতে তুলারামজী বললে :

—হিসটারী হয় মানুষের কথা নিয়ে। ভূত-পেত্নীর কাহিনী নিয়ে হিস্‌টারী হয় না।

—তবে কি নিয়ে হয় ?

—তোমার মাথা নিয়ে হয়।

ভাবীজী সকৌতুকে বললে :

—মাথা নিয়ে ভূতের কাহিনী হয় না, মাথার খুলি নিয়ে হয়।

স্ত্রীর বলবার ভঙ্গীটা তুলারামজীর খুবই নয়নাভিরাম মনে হল। মনের মধ্যে একটা কোন বাসনা উস্‌খুস্‌ করে উঠল তার।

সেদিক দিয়ে ভাবীজী খুবই চতুর। স্বামীর ভেতরের তড়িৎ প্রবাহটা সে বাইরে থেকেই টের পেয়ে গেল।

একটু মুখ টিপে হেসে সে বললে :

—পরে শুনব সব, এখন যাচ্ছি, কাজ আছে।

—না, না, পরে নয়—এখুনি শোন।

তুলারামজী তার হাত ধরে টেনে রাখলে।

—শ্যামাবাঈ মরে ভূত হয়ে গেছে না ?

শ্যামাবাঈর নাম শুনে ভাবীজীর মুখটা মেঘাবৃত হয়ে গেল, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে বাক্যালাপ এড়িয়ে যাবার জন্যে বললে :

—হাঁ।

—তার বিয়ে।

—কার সঙ্গে ?

ভাবীজীর ধৈর্যের বাঁধ জবাবের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ভেঙে গেল।

—তাড়াতাড়ি বলনা কার সঙ্গে।

হে-হে করে হাসলে তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা। কোমরটা চুলকে নিলে একবার।

—মহাদেও খেতন।

কোন্‌ মহাদেও খেতন! সূর্যাবাবুর ছেলে ?

তুলারামজী সকৌতুকে হাসলে :

—তা ছাড়া আর কে! ওর আগের বউ মরে ভূত হয়ে গেছে না, সে

এখন তার মাথায় সওয়ার করছে। মহাদেওটাও এখন ভূত। ভূতের সঙ্গে পেত্নীর বিয়ে। আমার নেমনতন্ন। রেশমী কার্ড ছাপিয়েছে।

সমস্ত শুনলে ভাবীজি।

—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—খবরদার!

তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা সবিক্রমে লাফিয়ে উঠল।

—তুমি যাবে কি! তবে হাঁ, আমি যাব। মে' মানুষের হুট্ বলতে ছুট, আমি পছন্দ করি না।

অতঃপর একটু শান্ত কণ্ঠে বললে:

—এখন ত' কিছু বলব না। তারপর দাঁড়াও না, ভাগ্নে-ভাগ্নী হোক, তাদের এ্যায়সা ট্রেনিং দেব—

—মানে?

ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে দাদ চুলকাতে লাগল তুলারামজী।

—মানে আবার কি! শ্যামাবাঈ খেতনদের বউ হবে, তাকে আর কি বলব? কিন্তু সে-শালারা ত' আমার ভাগ্নে-ভাগ্নী—আমার বাপ না থাকলে ওরা আসত কোথা থেকে!

—তুমি ওদের নেবে!

—আলবাৎ! মহাদেও আমার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে! আমি এখন কিছু বলব না—ওঝা পণ্ডিত সম্প্রদান করে করুক। আমি দ্বিরাগমন করাব। হাতী নাচাব—পঁচাশ হাজার খরচা করব।

—পঞ্চাশ হাজার!

—হাঁ, ঝোঁক চাপলে লাখ টাকা আতস বাজি করে দেব—ফায়ার ওয়ার্কস্!

ভাবীজী সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। টাকা আর হিসটারীর মানুষটা রক্ত-মাংসেরই মানুষ! মরা হিস্টারীর ওপর জীবন্ত মানুষ!

—বাঈ!

চৌকাঠের ওপার থেকে ডাক শুনে শ্যামাবাঈ সেদিকে তাকাল। সোলেমানের লুগাঈ দাঁড়িয়ে আছে। কোথা থেকে খবর পেয়েছে কে জানে। হয়ত ভাবীজীই তাকে বলে থাকবে।

সেজেগুজে এসেছে সোলেমানের লুগাঈ। কালো পেশোয়াজ, গোলাপী কোর্তা, সোণালী চুম্‌কি বসান মল্‌মলের ওড়না। পায়ে জরিদার পায়জার। মুখে হাসি।

—ওখানে কেন ! ঘরে এস।

—ঢুকব ?

শ্যামাবাঈ হাসল।

—হাঁ, এস।

স্বল্পমূল্য রঙীন ওড়নার ওপর সোণালী জরির বহুমূল্য হাসিঢালা ফুল তুলে উপহার স্বরূপ নিয়ে এসেছে সোলেমানের লুগাঈ।

—এটা তোমার জন্যে, বাঈ।

—দাও।

কতকটা বিস্মিত হয়ে সোলেমানের লুগাঈ বললে :

—আজ তোমার সাদি, তুমি সাজনি, বাঈ !

সাজতে শ্যামাবাঈ চেয়েছিল। নতুন শাড়ি, সায়া, জামা কিনে দিয়েছেন ওস্তাজী। কিন্তু শ্যামাবাঈ সাজতে পারেনি। ছেলেগুলো তাকে সাজতে দেয়নি। তাদের ভয় হয়েছে—বাঈ সাজলেই চলে যাবে।

সোলেমানের লুগাঈ বললে :

—এস বাঈ, আমি তোমায় সাজিয়ে দি ?

—না, না, বাঈ সাজবে না, বাঈ সাজবে না—

সবচেয়ে ছোটটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শ্যামাবাঈ বললে :

—না, আমি সাজব না।

অভ্যাগতদের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে তুলারাম পাঁপড়ওয়ালা। আজকার অনুষ্ঠানে কোন অংশ নেই তার। নিবিষ্ট দৃষ্টি তার আবদ্ধ হয়ে আছে শ্যামাবাঈর ওপর। মাঝে মাঝে দেখছে মহাদেও খেতনকে। গ্রানিটে গড়া দৃঢ়-কৃষ্ণ গালদুটি বেয়ে দুটি কোমল ধারা গড়িয়ে পড়েছে। মন তার ত্বরিত হস্তে ইতিহাসের পাতা উলটে চলেছে। আজ সে সামনে যা দেখছে হিসটারীতে তার কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না ; কিংবা হয়ত ভাবছে, এও এক হিসটারী। হিসটারীর নতুন পদক্ষেপ !

আর শ্যামাবাঈর পলিমাটির মত কোমল হাত নিজের কঠিন করতলে নিয়ে মণ্ডপের মাঝে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে মহাদেও খেতন অনুভব করছেন পায়ের তলার মাটিও কত নরম ! পঞ্চসতী-হৃদয়ের পবিত্র কোমলতা মেশান। পরম নির্ভরতায় একে আশ্রয় করা যায়।

আশ্রয় করা যায়, কিন্তু কেনা যায় না !

শেষ